হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা (মাসনূন মাসায়েল)

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশঃ ১৩ই এপ্রিল, ২০২২ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২৪শে মার্চ, ২০২৩ ঈসায়ী

তৃতীয় প্রকাশঃ ১লা অক্টোবর, ২০২৪ ঈসায়ী

প্রকাশনায়ঃ অন্তিম প্রকাশনী।

হাদিয়াঃ ১২০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র।

বই ডাউনলোডঃ http://cutt.ly/akhirujjamanbooks

যোগাযোগঃ backup.2024@hotmail.com

বই কিনুনঃ http://cutt.ly/ontim_prokashoni

ISLAMER BUNIYAD SHIKKHA WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY ABDUL GAFUR. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. SECOND PUBLISHED: 1st OCTOBER, 2024 ISAYI, 28th RABI AL-AWWAL, 1446 AH HIJRI.

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ‘‘হাবীবুল্লাহ মাহমুদ’’ নামে চিনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নামঃ

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে ‘বদরী কাফেলা’ নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগীতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। (উল্লেখ্য: ‘গাঁওপাড়া’ গ্রামটি নাটোর জেলার আওতাধীন বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন, পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। আর সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।)

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের বুনিয়াদ

ইসলামের বুনিয়াদ (খুটি, স্তম্ভ) ৫ টি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ইসলামের বুনিয়াদ ৫ টি। যথা-

১) আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল।

২) ছলাত ক্বয়িম করা।

৩) যাকাত প্রদান করা।

৪) হাজ্জ করা এবং

৫) রমাদানে ছিয়াম পালন করা (ছহীহ বুখারী, হা: ৮)

১. কালিমা তথা শাহাদাতাইন

■ কালিমা:

একথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে,

ক) আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই,

খ) এবং নিশ্চয়ই মুহম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল।

■ কালিমার অর্থ:

অভিধান প্রনেতাদের মতে-

কালিমা শব্দটি শাব্দিক অর্থ বিশিষ্ট একক শব্দ। আবার এটি একটি সামর্থক বাক্যকেও বুঝায়। (কালিমাতুশ শাহাদাহ, পৃঃ ১৬)

■ উল্লেখিত কালিমাটির নাম কি?

উপরে উল্লেখিত কালেমাটি আমাদের দেশে কালেমায় শাহাদাত হিসেবে পরিচিত এই কালেমাটিকে কালিমাতুশ শাহাদাতাইন বা দুইটি বাক্যের সাক্ষ্যও বলা হয়। কোন অমুসলিম যদি মুসলিম হতে চায় তাহলে তাকে এই কালেমার পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য দিয়ে, এর অর্থ দাবিসহ মানতে হবে। তবেই মুসলিম হওয়া যাবে। এই কালেমায় আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং মুহাম্মদ ﷺ এর রিছলাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

■ কালিমাতুশ শাহাদাহ ২ টি বাক্য দ্বারা গঠিত:

ক) لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই।

খ) مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল।

প্রথম বাক্যের আরবি অংশটিকে আবার কালিমাতুত তাওহীদ বলা হয়। কালেমায়ে তাওহীদ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। আর পরের অংশকে কালিমাতুর রিসালাহ বলা হয়।

ক. কালিমাতুত তাওহীদ

■ কালিমাতুশ শাহাদাহ তথা কালিমাতুত তাওহীদ ৩ টি নিয়মে পড়া যায়:

ক) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অর্থ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। (সূরা মুহাম্মাদ, আঃ ১৯)

খ) আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), ৪৯৯; তিরমিযী (অধ্যায়ঃ ছলাত, অনুঃ আযানের সূচনা, হাঃ ১৮৯) ইবনু মাজাহ (অধ্যায়ঃ আযান, হাঃ ৭০৬), বুখারী (‘আফ‘আলুল ‘ইবাদ’ (হাঃ ১৩৭), দারিমী (১১৮৭), আহমাদ (১১৮৭) আহমাদ (৩/৪৩) ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে)

গ) আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু। অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। (সুনানে আদ-দারাকুতনি, আততাহিয়াত)

■ কালেমায়ে তাওহীদ ২ টি অংশে ভাগ করা যায়:

ক) লা-ইলাহা   খ) ইল্লাল্লাহ।

(ক) "লা ইলাহা" তথা না বাচক এর মর্মার্থ এই যে, কোন সৃষ্টিই কারো ইবাদত, দাসত্ব, গোলামী করতে পারবেনা, কাউকে সার্বভৌম ক্ষমতাঁর মালিক মেনে নিতে পারবেনা, কাউকে বিধানদাতা মেনে নিতে পারবে না, কোন শক্তির প্রভুত্ব স্বীকার করতে পারবে না। এমনকি এই সকল কোন কাজের কেউ অংশীদারিত্ব আছে এ কথা মুখে তো দূরে থাক মনেও লালন-পালন করতে পারবে না। আর,

(খ) দ্বিতীয় ভাগের "ইল্লাল্লাহ" তথা হ্যাঁ বাচক এর মর্মার্থ এই যে ,একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা’য়ালাই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। একমাত্র আল্লাহ তা’আলা সার্বভৌম ক্ষমতাঁর মালিক, একমাত্র তিনিই বিধানদাতা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“জেনে রাখো, সৃষ্টি ও (সৃষ্টির উপর) বিধান একমাত্র তাঁরই অর্থাৎ আল্লাহরই”। (সূরা আরাফ, আঃ ৫৪)

সৃষ্টিতে, বিধানে, প্রভুত্বে সকল কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহ তা’আলারই, আর মুখে, অন্তরে, কর্মে একমাত্র আল্লাহরই তাওহীদ মেনে নিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

■ কালিমায়ে তাওহীদ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর প্রথম অংশের ‘লা ইলাহা’ তথা বর্জনীয় ইলাহ ৪ টি:

ক) ইসতিনাবুল আরবাব অর্থাৎ অসংখ্য রবদের বর্জন করা।

খ) ইসতিনাবুল আন্দাদ অর্থ সকল প্রকার সমকক্ষদের বর্জন করা।

গ) ইসতিনাবুল আলিহাহ অর্থাৎ সমস্ত বাতিল ইলাহদের বর্জন করা।

ঘ) ইসতিনাবুত তাওয়াগীত অর্থাৎ সকল প্রকার তৃগুতকে বর্জন করা।

(কালিমাতুশ শাহাদাহ, পৃষ্ঠা- ১৮)

■ কালেমায়ে তাওহীদের দ্বিতীয় অংশ ‘ইল্লাল্লাহ’ অর্থ গ্রহণীয় বিষয়:

কালেমায়ে তাওহীদের অনেকগুলো গ্রহণীয় বিষয় রয়েছে তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় ১৩টি।

১) আল্লাহকে এক, একক, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।

২) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিজিকদাতা, বিধানদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক এবং রক্ষাকারী রূপে বিশ্বাস না করা।

৩) একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, গায়েবের একমাত্র জান্তা বলে বিশ্বাস করা, আর কাউকে এরূপ বিশ্বাস না করা।

৪) আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে উপকার-অপকার, লাভ-ক্ষতির মালিক বলে বিশ্বাস না করা।

৫) আল্লাহকে একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাঁর অধিকারী বলে বিশ্বাস করা আর কেউ তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতাঁর শরিক নেই বলে বিশ্বাস করা।

৬) আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আইনদাতা-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস না করা, একমাত্র আল্লাহকেই আমাদের রব আইন-বিধান দাতা বলে বিশ্বাস করা।

৭) আল্লাহকে ইবাদত বন্দেগীর অধিকারী, সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী, মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করা।

৮) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা না করা।

৯) আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর নির্ভর এবং কারো নিকট আশা পোষণ না করা এবং কাউকে ভয় না করা।

১০) আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই সবচেয়ে প্রিয় না মানা এবং তাকেই অসীম করুণার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।

১১) কোন মানুষ, দল, সমাজ বা শাসন কৃতপক্ষে আল্লাহর আইন-বিধান শরীয়াতের পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকারী বলে গ্রহণ না করা।

১২) আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী, ক্ষমার অধিকারী এবং হেদায়েত দানকারী রূপে বিশ্বাস না করা।

১৩) আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত জাগ্রত এবং সৃষ্টি জগতের সব অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাকে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে বিশ্বাস করা, ছোট-বড় সকল কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করা। (কালিমাতুশ শাহাদাহ, পৃঃ ৩১)

■ তাওহীদের বিপরীতে ত্বগুত:

طاغوت (ত্বগুত) শব্দটির মাসদার (ক্রিয়ামূল) হল طغيان (তুগইয়ানুন)। যার অর্থ সীমালংঘন করা। যেমন নদীর পানি দুই তীর দ্বারা বেষ্টিত থাকাই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু পানি যখন তাঁর দুই তীর তথা সীমা অতিক্রম করে উপরে উঠে আসে তখন আরবিতে বলা হয় (طلعت الماء) অর্থাৎ পানি সীমালংঘন করেছে। তদ্রূপ মানুষ একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত ও অনুগত্য করবে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁরই আইন-কানুন মেনে চলবে, এটাই আল্লাহর নিয়মের স্বাভাবিক কিন্তু মানুষ যখন এই স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করে নিজেই আনুগত্য বা ইবাদত গ্রহণের দাবিদার হয়ে বসে তখনই সে ত্বগুতে পরিণত হয়ে যায়।

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহিঃ) বলেন, "ত্বগুত হল সকল উপাস্য, নেতা-নেত্রী, মুরুব্বী যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালংঘন করা হয়। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে ﷺ বাদ দিয়ে যাদের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়া হয় অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয় অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলিল প্রমাণ ছাড়া যাদের আনুগত্য করা হয় অথবা আল্লাহর অনুগত্য মনে করে যে সকল গাইরুল্লাহর ইবাদত করা হয়। এরাই হলো পৃথিবীর বড় বড় ত্বগুত। তুমি যদি এই ত্বগুতগুলো এবং মানুষের অবস্থার

প্রতি লক্ষ্য করো, অধিকাংশ মানুষকেই দেখতে পাবে যে তারা আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে ত্বগুতের ইবাদত করে। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ﷺ কাছে (কুরআন ও সুন্নাহ এর কাছে) বিচার ফয়সালা চাওয়ার পরিবর্তে ত্বগুতের কাছে বিচার ফায়সালা নিয়ে যায়। আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করার পরিবর্তে ত্বগুতের অনুগত্য করে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে ত্বগুতের নির্দেশ পালন করে।" (কালিমাতুশ শাহাদাহ, পৃষ্ঠা- ২৩; আত-তাওহীদু আওলান, ১/১৯; ফাতহুল মাজীদ, ১/২৬)

■ ত্বগুতের প্রকারভেদ:

ত্বগুতের প্রকার অনেক। তাঁর মধ্যে বর্তমান সমাজে অধিক ভূমিকায় থাকা প্রধান প্রধান ত্বগুত ৯ টি।

১। ইবলীস। (সূরা ইয়াসীন, আঃ ৬০-৬১)

২। আল্লাহর আইন বিরোধী অত্যাচারী শাসক। (সূরা নিসা, আঃ ৬০-৬১, ৬৫)

৩। আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালাকারী বিচারক। (সূরা মায়িদাহ, আঃ ৪৪-৪৫, ৪৭)

ইমাম সুদ্দি (রহিঃ) বলেন, "যদি (কেউ) ইচ্ছা পূর্বক আল্লাহর ওহীর বিপরীত ফাতওয়া দেয়, জানা সত্ত্বেও তাঁর উল্টা করে, তবে সে কাফির। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশকে অস্বীকার করবে তাঁর হুকুম এটাই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করলো না, কিন্তু তা আল্লাহর বিধান মোতাবেক করল না, সে জালিম ও ফাসিক। (তাফসিরে ইবনে কাছীর, ডঃ মজিবুর রহমান, খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৮৩৬)

৪। ইলমে গায়েবের দাবিদার।

যারা ইলমে গায়েবের বা অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি করে তারাও ত্বগুত। এদের মাঝে রয়েছে জ্যোতিষী, ভবিষ্যৎবক্তা, গনক, ধর্মীয় যাজক, পুরোহিত ইত্যাদি। (সূরা আনআম, আঃ ৫৯)

৫। পীর-ফকির।

আমরা কম বেশি সকলেই জানি নবীগণের ওয়ারিশ আলেম ওলামা, আর এটাও ঠিক যে নবীগণের মৃত্যুর পর প্রকৃত ইসলামের দিকে আহ্বান করা আলেম-ওলামাদেরই

দায়িত্ব। আর প্রকৃত ইসলামের প্রধান আহ্বান হলো তাওহীদকে গ্রহণ কর আর ত্বগুতকে বর্জন করো, অথচ অধিকাংশ মানুষের অজ্ঞতাঁর কারণে এই অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ধর্ম নিয়ে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী আলেম, পীর-ফকির, ধর্মীয় যাজক-পুরোহিত, ধর্ম প্রচারক সেজে আল্লাহর দিকে আহ্বান না করে বরং তাদের নিজেদের ইবাদত, নিজেদের গোলামী করার জন্য মানুষকে আহ্বান করছে। গাজী মুহাম্মাদ তানজিম সাহেব বলেন, 'এরা মানুষের নিকট থেকে দুইভাবে ইবাদত নেয়'।

(ক) আক্বীদা বা বিশ্বাসগতভাবে। এবং (খ) আমলগত ভাবে।

যেমন তারা বলে- 'যার পীর নাই তাঁর শির নাই', 'যার পীর নাই তাঁর পীর শয়তান', 'পীরের কাছে মুরিদ হওয়া ফরয'। এমন আরো অনেক কিছু তারা বলে থাকে। অথচ ফরয বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত কোন ইবাদতকে ফরয বলা যায় না। পীর-সুফীগণ মনগড়া ইবাদত তৈরি করে, মনগড়া বহু তরীকা তৈরি করে আবার এক এক তরীকার একেক যিকির। এ সবকিছুই আল্লাহর শরীয়ত থেকে ভিন্ন, বাতিল ও ভ্রান্ত একটি শরীয়ত যা পরিত্যাজ্য, যা পীর-ফকিরেরা নিজেরাই তৈরি করেছে। অথচ এ জাতীয় শরীয়ত তৈরি করার অধিকার আল্লাহ তায়ালা কাউকে দেননি। এজন্য এরাও তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা শুরা, আঃ ২১; সূরা আম্বিয়া, আঃ ২৯)

৬। জাদুকর। (সূরা বাকারাহ, আঃ ১০২)

৭। তাকলীদুল আবা অর্থাৎ বাপ-দাদা বা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করা। (সূরা বাকারাহ, আঃ ১৭০)

৮। দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও তাঁর প্রবর্তকগণ।

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন যেমন- গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি এবং এমন আরো যত তন্ত্র-মন্ত্র আছে তা প্রতিষ্ঠাকারীগণ, প্রবর্তনকারীগণ, ক্ষমতাঁর বলে তাতে নতুনত্ব (নতুন হুকুম-আইন) আনয়নকারীগণ, যারা ইসলামের বিপরীত জীবনাদর্শ পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ও সেই অনুযায়ী মানুষের উপরে হুকুমাত চালিয়ে যায় তারা সকলেই ত্বগুত। (সূরা আলে-ইমরান, আঃ ১৯)

৯। হাওয়া বা প্রবৃত্তি (খেয়াল খুশির অনুসরণ করা)। (সূরা ফুরকান, আঃ ৪৩)

■ ত্বগুতকে অস্বীকার বা বর্জন করা ফরয:

যে ব্যক্তি কালিমাতুশ শাহাদার স্বীকারোক্তি দিয়ে মুসলিম হবে, তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম পালনীয় ফরয হলো কুফর বিত ত্বগুত বা ত্বগুতকে অস্বীকার করা।
এবং ঈমান বিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহকে স্বীকার করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।...' (সূরা নাহল, আঃ ৩৬)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব, যে ত্বগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙ্গবে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।' (সূরা বাকারাহ, আঃ ২৫৬)

■ জানা প্রয়োজন:

অনেক জন্মসূত্রে মুসলমান রয়েছে তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, প্রায় প্রতি বছরে হজে-ওমরা হজে যায়, দান সদাকাও করে, অথচ ত্বগুতকে চিনে সে যাবতীয় ত্বগুতকে বর্জন বা অস্বীকার করেনি। তবে সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না। বরং সে মুশরিক হবে এবং এই জাতীয় মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের বেশীর ভাগই আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, তবে তাঁর সাথে (ইবাদতে) শির্ক করা অবস্থায়।' (সূরা ইউসুফ, আঃ ১০৬)

■ ত্বগুতকে অস্বীকার করার উপায় ৫ টি। যথা-

১। ত্বগুতের ইবাদত বাতিল এই আকিদা পোষণ করা।
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।...' (সূরা নাহল, আঃ ৩৬)

২। ত্বগুতকে পরিত্যাগ ও ত্বগুত থেকে দূরে থাকা।
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।...' (সূরা নাহল, আঃ ৩৬)

৩। ক্রোধ ও ঘৃণা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের সঙ্গে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে।' (সূরা মুমতাহিনা, আঃ ৪)

৪। তৃগুতের সাথে দুশমনি বা শত্রুতা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যাদের ইবাদত তোমরা করে থাক, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরা! সৃষ্টিকুলের রব ব্যতীত এরা সবাই তো আমার শত্রু।' (সূরা শুআ'রা, আঃ ৭৫-৭৭)

৫। তৃগুত নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তৃগুতের সাথে জিহাদে লিপ্ত থাকা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফের তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।' (সূরা নিসা, আঃ ৭৬)

খ. কালিমাতুর রিসালাহ

কালিমাতুর রিসালাহ বলতে কালিমাতুশ শাহাদার দ্বিতীয় অংশকে বুঝায় যে অংশে আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

■ কালিমাতুর রিসালাহ ৪ টি নিয়মে পড়া যায়:

ক) মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। অর্থ- মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। (সূরা ফাতহ, আঃ ২৯)

খ) ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। অর্থ- এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। (ছহীহ বুখারী, হাঃ ৮)

গ) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। (আবু দাউদ ৫০১, ৫০৭, ৫২৭)

ঘ) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু। অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রসূল। (ছহীহ বুখারী, হাঃ ৮, আত্তাহিয়াতু)

■ কালিমাতুর রিসালাহ এর দাবি ৫ টি:

ক) আল্লাহর রসূল ﷺ যা কিছু আদেশ করেছেন তা নির্দ্বিধায় মেনে চলা।

খ) পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর রসূল ﷺ কে অনুসরণ করা।

গ) রসূল ﷺ এর দেয়া যাবতীয় বার্তা-সংবাদকে নিঃসন্দেহে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

ঘ) তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।

ঙ) তাঁর দেখানো তরীকা অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম পালন করা। শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু যোগ বা সংযোজন না করা এবং নিজের মনগড়া পন্থায় আল্লাহর ইবাদত না করা।

■ কালিমাতুর রিসালাহ এর মর্মকথা ১৩ টি:

১। মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি এবং তাঁর নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর উপর ঈমান আনা। (সূরা নিসা, আঃ ১৩৬)

২। একমাত্র রসূল ﷺ কেই উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। (সূরা আহযাব, আঃ ২১)

৩। সর্বদা রসূল ﷺ কে সম্মান করা। (সূরা ফাতহ, আঃ ৯)

৪। পৃথিবীর সবকিছু থেকে, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও তাকে বেশি ভালোবাসা। নবী ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউই ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না আমি তাঁর কাছে তাঁর পিতা, সন্তান, এমনকি দুনিয়ার সমস্ত মানুষ হতে প্রিয় হব।' (ইবনে মাজাহ, হাঃ ৬৭; ছহীহ বুখারী, হাঃ ১৫; ছহীহ মুসলিম, হাঃ ৪৪)

৫। তাঁর ﷺ প্রতি সালাম জানানো। (সূরা আহযাব, আঃ ৫৬)

৬। দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর ﷺ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া। (সূরা আহযাব, আঃ ৩৬)

৭। কোন অবস্থাতেই তাঁর ﷺ সাথে খেয়ানত না করা। (সূরা আনফাল, আঃ ২৭)

৮। তাঁর ﷺ আদেশ অমান্য না করা। (সূরা আনফাল, আঃ ২০)

৯। তাঁর ﷺ বিরুদ্ধাচরণ না করা। (সূরা নিসা, আঃ ১৪)

১০। কোনভাবেই তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করা। (সূরা আনফাল, আঃ ২৭)

১১। আল্লাহর রসূল ﷺ কে নিয়ে অতিরঞ্জিত কোন কিছু না করা। রসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা আমার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন ভাবে নাসারাগণ (খ্রিষ্টানেরা) ঈসা ইবনে মারিয়াম এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো একজন বান্দা ছাড়া আর কিছুই না। তাই তোমরা বলো- আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। (ইবনে হিব্বান, হাঃ ৬২৩৯; ছহীহ বুখারী, হাঃ ৩৪৪৫)

১২। মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবী ও রসূল। তাঁরপর আর কোন নবী বা রসূলের আগমন ঘটবে না এবং তা স্বীকৃতি দেয়া। (সূরা আহযাব, আঃ ৪০)

১৩। আল্লাহ গায়েব সম্পর্কে না জানালেও মুহাম্মাদ ﷺ গায়েব সম্পর্কে জানেন এমন কথা বিশ্বাস না করা। (সূরা আনআম, আঃ ৫০)

■ মাসায়িল:

ভারতীয় উপমহাদেশের টাইলসযুক্ত প্রায় বেশ কিছু মাসজিদের মেহরামের দুই পাশের দেয়ালের একপাশে আল্লাহ আরেক পাশে মুহাম্মাদ লেখা থাকে (আরবীতে)। এমন লেখা শিরকের উৎপত্তি ঘটায়। এমন লেখা রাখা জায়েজ নেই।

ঈমান আনয়ন

উপরে উল্লেখিত দুটি বাক্যের তথা দুটি কালিমা অর্থাৎ কালিমাতুত তাওহীদ ও কালীমাতুর রিছলাত এর সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে ঈমান আনয়ন করতে হয়।
এই দুইটি বাক্য বা কালিমার যে কোন একটিও অস্বীকার করলে, মেনে নিতে না চাইলে সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট কাফের বলে গণ্য হবে।

■ ঈমান আনয়নের পূর্বশর্ত ৭ টি:

১। আল ইলম। অর্থাৎ, ঈমান সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই।' (সূরা মুহাম্মাদ, আঃ ১৯)

২। আল ইয়াকিন। অর্থাৎ, নিশ্চিতভাবে ঈমান আনয়ন কোন সন্দেহ ছাড়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি, এবং সে কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। আর সে গ্রন্থের প্রতিও যা তাঁর পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন।' (সূরা নিসা, আঃ ১৩৬)

৩। আস সিদক। অর্থাৎ, সত্যবাদিতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।' (সূরা মুনাফিকুন, আঃ ১)

৪। আল ইখলাস। অর্থাৎ, অন্তরে একাগ্রতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং ছলাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দ্বীন।' (সূরা বায়্যিনাহ, আঃ ৫)

৫। আল কবুল। অর্থাৎ, প্রকাশ্য এবং গোপনে ঈমানের স্বীকৃতি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ওদের নিকট 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহংকারে অগ্রাহ্য করত। এবং বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব?' (সূরা সাফফাত, আঃ ৩৫-৩৬)

৬। আল ইনকিয়াদ। অর্থাৎ, আত্মসমর্পণ। কুরআন ও সুন্নাহ এর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তাঁরপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।' (সূরা নিসা, আঃ ৬৫)

৭। আল মুহাব্বত। অর্থাৎ, ভালোবাসা। (কালিমাতুশ শাহাদাহ, পৃষ্ঠা- ৩৪)

■ ঈমান ভঙ্গের অন্যতম কারণ ১০ টি:

জানা প্রয়োজন, অনেক মুসলমানই জানে না ঈমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে বরং তাদের বিস্ময় লাগে যখন তারা শোনে ঈমান ভঙ্গেরও কারণ রয়েছে। যেমন অযু ভঙ্গের কারণ আছে, ছলাত ভঙ্গের কারণ আছে, সিয়াম ভঙ্গের কারণ আছে, তেমনিভাবে ঈমান ভঙ্গেরও কারণ রয়েছে। তাঁর মধ্য থেকে বড় বড় ১০ টি কারণ উল্লেখ করছি।

১। আল্লাহর ইবাদতে শরীক বা অংশীদার স্থাপন করা। (সূরা বনী ইসরাঈল, আঃ ৩৯)

২। যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং বান্দার মাঝে কাউকে মাধ্যম তৈরি করে তাদেরকে ডাকে এবং তাদের নিকট শাফায়াত কামনা করে। (সূরা ইউনুস, আঃ ১৮)

৩। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করে অথবা তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদ সমূহকে সঠিক মনে করে। (সূরা বাইয়িনাহ, আঃ ৬; সূরা বাকারাহ ২২১)

৪। যদি কোন মুসলিম নাবী করিম ﷺ এর দেখানো পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ পরিপূর্ণ মনে করে অথবা ইসলামী শাসনব্যবস্থা বা বিধান ব্যতীত অন্য কারো তৈরি হুকুমাত উত্তম মনে করে। (সূরা আহযাব, আঃ ৩৬)

৫। যদি কোন মুসলমান আল্লাহর নাবী ﷺ এর আনিত বিধানের কোন অংশকে অপছন্দ করে তবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে, যদিও সে ওই বিষয়ে আমল করে। (সূরা মুহাম্মাদ, আঃ ৮-৯)

৬। যদি কোন মুসলিম মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত ধর্মের কোন বিষয় অথবা ধর্মীয় ছওয়াব বা শাস্তির ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তবে সেও কাফির হয়ে যাবে। (সূরা তাওবাহ, আঃ ৬৫-৬৬)

৭। যদি কেউ যাদুর মাধ্যমে ভালো কিছু অর্জন, মন্দ কিছু উপার্জন করতে চায় অথবা স্বামী স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন বা আগুন ধরাতে গোপনে বা প্রকাশ্যে মন্ত্র-তন্ত্র করতে চায় অথবা কারো সাথে ছেলে-মেয়ে সম্পর্ক স্থাপন বা বন্ধুত্বের ফাটল ধরাতে চায়। (সূরা বাকারাহ, আঃ ১০২; ছহীহ বুখারী, হাঃ ২৭৬৬)

৮। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করলে। (সূরা মায়িদাহ, আঃ ৫১; সূরা মুমতাহিনা, আঃ ১)

৯। যে ব্যক্তি মনে করে মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে জীবন পরিচালনা করলেও জান্নাত পাওয়া যাবে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব। (সূরা আলে-ইমরান, আঃ ৮৫)

১০। আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। (সূরা সাজদাহ, আঃ ২২; ছহীহ বুখারী, হাঃ ৩০১৭)

(বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন-
"ঈমান বিধ্বংসী দশটি কারণ এবং তাঁর বিবরণ" -খায়রুল ইসলাম বিন ইলিয়াস)

২. ছলাত ক্বায়েম করা

■ জানা প্রয়োজন:

বর্তমান সমাজে ছলাতের নাম সম্পর্কে দুইটি পক্ষ ধাক্কা-ধাক্কি করতে দেখা যায়। যাদের এক পক্ষ বলেন-নামায। যদিও তারা ‘‘ছলাত’’ শব্দ কখনই অস্বীকার করে না। তারা জনসাধারণের সহজে বুঝার লক্ষ্যে জনসাধারণের মুখে ব্যপক প্রচারিত ও পরিচিত শব্দটিই ব্যবহার করেন। যেই শব্দটি ব্যবহার করলে গোনাহ্ নেই। অপর পক্ষ প্রথম পক্ষের শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন এবং তাদের সদস্যগণের মাঝে বেশি বেশি নামাজ শব্দের পরিবর্তে ‘‘ছালাত’’ শব্দ ব্যবহারের উৎসাহ দান করেন। এ প্রসঙ্গে তাদের সদস্যদের অনেকরই নিকট থেকে শোনা যায়, ছলাত শব্দ ব্যবহারে ছওয়াব (নেকী) রয়েছে। তাদের লেখা ছলাত সংক্রান্ত প্রায় সকল কিতাবেই ‘ছলাত/ছালাত’ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

অথচ কুরআন-সুন্নাহতে ‘ছালাত’ শব্দ নেই বরং ছলাত শব্দ উল্লেখ রয়েছে। যদি জনসাধারণকে ছহীহ শব্দ উচ্চারণ বা লেখতে শিখাতে হয়, তবে তাদেরকে ‘ছলাত’ শব্দ ব্যবহারই শিখানো প্রয়োজন। প্রকৃত কথা হলো- নামাজ ও ছলাত শব্দ ব্যবহার নিয়ে ধাক্কা-ধাক্কি বন্ধ করা চাই।

■ ছলাত:

ছলাত শব্দের আভিধানিক অর্থ- দু’য়া, রহমত, ক্ষমা প্রর্থনা করা ইত্যাদি।

ছলাত শব্দের পারিভাষিক অর্থ- শারীয়াহ নির্দেশিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ তা’য়ালার নিকট বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদতকে ‘‘ছলাত’’ বলা হয়। যা তাকবিরে তাহরিমা দ্বারা শুরু করা হয় ও সালাম দ্বারা শেষ হয়। (ছহীহ মুসলিম ও আবু দাউদ, হাঃ ৭৮৩)

■ ছলাত ফরয ৫ ওয়াক্ত:

মুসলিমদের উপর ছলাত ৫ ওয়াক্ত সময়ে ফরয করা হয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ যারা কুরআন-হাদিসের সঠিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়নি বা সঠিক হেদায়াত পায়নি তারা বলে থাকে কুরআনে ৫ ওয়াক্ত ছলাতের কথা স্পষ্ট করে বলা নেই, তাই কুরআনের আয়াত

ব্যাখ্যা করে বলে ছলাত ৩ ওয়াক্ত বা ২ ওয়াক্ত। তাদের জন্য সূরা আর-রূম এর **১৭-১৮** নং আয়াতের তাফসীরের অংশ এখানে তুলে ধরলাম-

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেউ জিজ্ঞেস করল, কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাতের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত পেশ করলেন (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ) এর অর্থ মাগরিবের ছলাত, (وَحِينَ تُصْبِحُونَ) শব্দে ফজরের ছলাত, عَشِيًّا দ্বারা আসরের ছলাত এবং حِينَ تُظْهِرُونَ শব্দে যোহরের ছলাত উল্লেখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে (وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ) [সূরা আন-নূর: ৫৮] এশার ছলাতের কথা এসেছে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৫, নং ৩৫৪১] অবশ্য হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহর মতে (حِينَ تُمْسُونَ) মাগরিব ও এশা উভয় ছলাতই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [বাইহাকী, সুন্নানুল কুবরা: ১/৩৫৯] সে হিসেবে এ সূরাতেই সমস্ত ছলাতের উল্লেখ আছে বলা যায়। (তাফসীরে জাকারিয়া)

■ ছলাত আদায়ের ফাযিলাত:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই ছলাত নির্লজ্জ ও অপছন্দনীয় কাজসমূহ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত, আঃ ৪৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন ছলাতে দাড়ায়, তখন তাঁর সমস্ত গুনাহ উপস্থিত করা হয় অতঃপর তা তাঁর মাথায় ও দুই কাঁধে রেখে দেওয়া হয়। এরপর সে ব্যাক্তি যখন রুকু বা সিজদায় যায় তখন গুনাহসমূহ ঝড়ে পড়ে।" (ছহীহুল জামে, হাঃ ১৬৭০)

■ জামা'আতে ছলাত আদায়ের গুরুত্ব ও ফাযিলাত:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এবং ছলাত ক্বায়েম কর, যাকাত আদায় কর আর রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সূরা বাকারাহ, আঃ ৪৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, "একা ছলাত আদায়ের চেয়ে জামা'য়াতে ছলাত আদায়ের মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশী।" (ছহীহ মুসলিম, হা: ২৩১; ছহীহ বুখারী, হা: ৬৪৫)

■ মাসজিদে ফরয ছলাত আদায়ের ফাযিলাত:

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, “মাসজিদে জামা’আতের সাথে ছলাত আদায় করলে ঘরে বা বাজারে ছলাত আদায়ের চেয়ে পঁচিশ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ভালো করে অযু করে, কেবল ছলাত এর উদ্দেশ্যে মাসজিদে আসে, সে মাসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত যত বার কদম রাখে তাঁর প্রতিটির বিনিময়ে আল্লাহ্ তা’য়ালা তাঁর মর্যাদা ক্রমান্বয়ে উন্নতি করবেন এবং তাঁর একটি করে গুনাহ্ মাফ করবেন। আর মাসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত ছলাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তাকে ছলাতেই গণ্য করা হয়। আর ছলাত শেষে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকে ততক্ষণ মালাকগণ (ফেরেস্তাগণ) তাঁর জন্য এ বলে দু’য়া করেন- হে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্ তাকে রহম করুন, যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় বা অযু ভেঙ্গে যাওয়ার কোন কাজ সেখানে না করে।” (ছহীহ বুখারী, হা: ৪৭৭)

■ ছলাত আদায়ের পূর্বশর্ত ২ টি:

১। ঈমান আনায়ন করা।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, “মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী শিকার করে, তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এমন হতে পারে না। উহারা এমন যাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হইয়াছে।” (সূরা আত-তাওবাহ, আঃ ১৭)

২। জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

কোন পাগল কিংবা ৭ বছরের কম বয়সী সন্তানের জন্য ছলাত আদায় করা জরুরি নয়। আব্দুল মালেক ইবনে রাবি ইবনে ছাবুরা থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রছূল (ছঃ) বলেছেন, “শিশুর বয়স ৭ বছর হলেই তাকে ছলাত আদায়ের নির্দেশ দিবে এবং তাঁর বয়স ১০ বছর হয়ে গেলে (ছলাত আদায় করতে না চাইলে) এজন্য তাকে প্রহার করিবে।” (আবু দাউদ, হা: ৪৯৪; সুনানে তিরমিযী, হা: ৪০৭)

■ ছলাত আদায়ের শর্তসমূহ ৭ টি:

১। শরীর পবিত্র হওয়া।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তবে বিশেষ ভাবে পবিত্র হইবে।" (সূরা আল-মায়িদাহ, আঃ ৬)

২। কাপড় পবিত্র হওয়া।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আর তোমরা পোশাক পরিচ্ছেদ পবিত্র কর।" (সূরা আল-মুদ্দাসসীর, আঃ ৪)

৩। সলাতের স্থান পবিত্র হওয়া। (ছলাতুর রাসুল (ছঃ), পৃষ্ঠা- ৪৫)

৪। ছতর ঢাকা। (ফিকহুস সুন্নাহ, ১/১২৫)

(ক) পুরুষের নাভী থেকে হাটুর নিচ টাকনুর উপর পর্যন্ত ঢেকে রাখা।

(খ) মহিলাদের দুই হাতের তালু ও চেহারা ব্যতীত মাথা হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত ছতর হিসাবে ঢেকে রাখা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তাহারা অর্থাৎ নারীরা যেন, যাহা সাধারণত প্রকাশ থাকে (অর্থাৎ দুই হাতের তালু ও চেহারা) তাহা ব্যতীত তাহাদের আবরণ প্রদর্শন না করে। তাদের ঘাড় ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে।" (সূরা আন-নূর, আঃ ৩১)

৫। ছলাতের ওয়াক্ত হওয়া।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "নির্ধারিত সময়ে ছলাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য আবশ্যক ও কর্তব্য।" (সূরা আন-নিসা, আঃ ১০৩)

৬। কিবলা মুখী হওয়া।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "অত:এব তুমি মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাও, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও।" (সূরা আল-বাকারাহ, আঃ ১৪৪)

৭। ছলাতের নিয়াত বা সংকল্প করা।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর মুখে বলতে শুনেছি "যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল।" (রিয়াদুছ ছলিহীন, হা: ১)

■ জানা প্রয়োজন:

নিয়ত বা সংকল্প মনে মনে করতে হবে। আরবি ভাষায় মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত বা সংকল্প করা সঠিক নয়।

■ ছলাত আদায়ের ফরয সমূহ ৬ টি:

১। কিয়াম করা বা দাড়ানো।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা ছলাতের প্রতি যত্নবান হইবে, বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরে) ছলাতে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনয়ী ভাবে দাড়াইবে।" (সূরা আল-বাকারাহ, আঃ ৩৮)

জানা প্রয়োজন: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ আদেশ করেছেন, "দাড়িয়ে ছলাত আদায় কর, যদি তাতে অপারগ হও তবে বসে আদায় কর, তাতেও অপারগ হলে শুয়ে আদায় কর।" (ছহীহ বুখারী, হা: ১৫০)
ড. শাইখ মোহাম্মদ ইলিয়াছ ফয়সাল সাহেব বলেন, সুস্থ ব্যাক্তির জন্য দাড়িয়ে নামাজ পড়া জরুরী। কেউ যদি দাড়িয়ে পড়তে অপারোগ হয়, তাহলে বসে পড়তে পারবে। বসে পড়তে অপারোগ হলে, শয়ীত অবস্থায় পড়বে এবং রুকুর তুলনায় সাজদায় মাথা বেশী ঝুকাবে। যদি এভাবেও নামাজ পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে নামাজ বিলম্বিত করার অনুমতি রয়েছে। (নবীজি (সঃ) এর নামাজ, পৃষ্ঠা- ১৪৬)
অতঃপর আমি (মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর) শ্রদ্ধেয় শায়েখের কথায় সমর্থন দিয়ে বলছি, এটা সেই ব্যাক্তির জন্য বিধান যিনি সুস্থ কিন্তু কোন কারণবশত কিছু সময় বা কিছু দিনের জন্য, অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে। যা উল্লেখিত হাদিছ ও শাইখের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে যদি কেউ স্থায়ী ভাবে শারীরিক অসুস্থ থাকে এবং তাঁর উপর ছলাত ফরয হয়, যেমন- সে চলা ফেরা করতে পারে, কিন্তু সে উঠা-বসা করে ছলাত আদায়ে সক্ষম নয় অথবা বসে ছলাত আদায় করতে পারলেও, বসার পরে একা উঠে দাড়াতে সক্ষম নয়। তবে সেই ব্যাক্তি তাঁর সুবিধা অনুযায়ী ছলাত আদায় করবে। যেমন- নিজ বাসস্থান বা মহল্লার মাসজিদে ছলাত আদায় করলে তাঁর সুবিধা অনুযায়ী চেয়ারে বসে ছলাত আদায় করতে পারবে। অথবা দাড়িয়ে থেকেই মাথা একটু কম নিচু করে রুকু করবে এবং মাথা একটু বেশী নিচু করে

সেজদা দিবে। সফরের হালতেও অনুরূপ ভাবে ছলাত আদায় করতে পারবে, কেননা মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

"আল্লাহ কারো উপর তাঁর সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। যা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক।" (সূরা আল-বাকারাহ, আঃ ২৮৬)

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চান এবং যাহা তোমাদের জন্য কষ্ট কর তাহা চান না।" (সূরা আল-বাকারাহ, আঃ ১৮৫)

"ত্ব'হা। তোমাকে কষ্ট দেওয়া জন্য তোমার প্রতি আমি কুরআন নাযিল করিনি।" (সূরা ত্ব'হা, আঃ ১-২)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী (ছঃ) বলেছেন, "দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বন কারীরা ধ্বংস হয়ে গেল (অথবা ধ্বংস হোক) একথা তিনি তিন বার বলেন।" (রিয়াদুছ ছলিহীন, হা: ১৪৮/মুসলিম, হা: ২৬৭০/আবু দাউদ হা: ৪৬০৮)

২। তাকবিরে তাহরীমা অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে ছলাতের উদ্দেশ্যে হাত বাধা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "এবং তোমরা প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্য ঘোষণা কর।" (সূরা আল-মুদ্দাসসির, আঃ ৩)

৩। রুকু করা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমরা ছলাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং যাহারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।" (সূরা বাকারাহ, আঃ ৪৩)

৪। সিজদাহ করা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে মু'মিনগণ, তোমরা রুকু কর, সিজদাহ কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাহাতে সফলকাম হইতে পার।" (সূরা আল-হাজ্জ, আঃ ৭৭)

জানা প্রয়োজন: রুকু-সিজদাহ অবশ্যই ধীর-স্থির ভাবে উত্তম রূপে পড়তে হবে। কেননা জমহুর আলেমের নিকট তা রুকন।

৫। শেষ তাশাহুদ ও বৈঠক করা।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তাশাহুদ ফরয হওয়ার পূর্বে আমরা বৈঠকে বলতাম আল্লাহর বান্দার পূর্বেই আল্লাহর উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হক। তাঁরপর

জিবরাইল ও মিকাইল (আঃ) এর উপর সালাম বা শান্তি বর্ষিত হক। (বায়হাকী, হা:৩৯৬২) অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে তাশাহুদ শিখিয়ে দিলেন। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা- ২০২)

৬। সালাম ফিরানোর মাধ্যমে ছলাত আদায় শেষ করা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, "রসূল ﷺ সালামের মাধ্যমে ছলাত শেষ করতেন।" (ছহীহ মুসলিম, হা: ৪৯৮; আবু দাউদ, হা: ৭৮৩)

■ ছলাতের ওয়াজিব সমূহ ৯ টি:

ছলাতের ফরয সমূহের পরেই ছলাতে ওয়াজিব সমূহের স্থান। যা ইচ্ছাকৃত ভাবে আদায় না করলে, ছলাত বাতিল হয়ে যায়। আর ভুলক্রমে আদায় না করলে, সিজদাহে সাহু দিতে হয়। (ছলাতুল রাসুল (ছাঃ) পৃষ্ঠা- ৫১; নবীজি (সঃ) এর নামাজ, পৃষ্ঠা- ২১৮)

১। তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য সকল তাকবীর বলা।

২। রুকু ও সিজদার তাসবীহ বলা।

হাদিস: হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহুর রসূল ﷺ যখন ছলাতে দাড়াতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন। যখন রুকুতে যেতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন। যখন রুকু থেকে পিঠ মাথা তুলতেন তখন (ছামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ) অর্থাৎ (যে ব্যাক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তাঁর কথা শুনেন) বলতেন। অতঃপর দাড়িয়ে রব্বানা লাকাল হামদ (অর্থাৎ হে আমাদের প্রতি পালক সকল প্রসংসা তোমার) বলতেন। যখন সিজদায় ঝুকতেন, তখন আল্লাহু আকবার বলতেন, যখন সিজদাহ হতে মাথা তুলতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন, যখন দ্বিতীয় সিজদাহ করতেন ও সিজদাহ হতে মাথা তুলতেন, তখন আল্লাহু আকবার বলতেন। অতঃপর ছলাত শেষ করা পর্যন্ত এ রুপ করতেন। (ছহীহ বুখারী, হা: ৭৮৯)

উপরে উল্লেখিত তিনটি বিষয় ছলাতে ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী ব্যাক্তির উপর ওয়াজিব। (ফিকহুস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা- ২২২)

৩। তাকবীরে তাহরীমা বা ছলাত শুরুর প্রথম তাকবীরের পর ছানা পাঠ করা।

হাদিস: হযরত রিফায়া বিন রাফে (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ছলাতে ভুলকারীকে বললেন, কোন ব্যাক্তির অযু না করা পর্যন্ত ছলাত হবে না। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলবে, মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে ও তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা করবে এবং কুরআনে যেটুকু সহজ (মনে করবে) সেটুকু তিলাওয়াত করবে। যদি কেউ এরকম করে, তাহলে তাঁর ছলাত পূর্ণ হল। (আবু দাউদ, হা: ৮৫৭; নাসায়ী, হা: ১১৩৬; তিরমিযী, হা: ৩০২)

ইমাম সানয়ানী (রহিঃ) বলেন, উল্লেখিত হাদিস থেকে এটা সাব্যস্ত হয় যে, তাকবীরে তাহরীমার পর আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা অর্থাৎ ছানা পড়া ওয়াজিব। (সুবুলুছ ছালাম, ১/৩১২)

৪। তা'য়ুজু (আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রজীম) পাঠ করা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যখন তুমি কুরআন পাঠ (করার ইচ্ছা) করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।" (সূরা নাহল, আঃ ৯৮)

৫। সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তুমি কুরআন হইতে তিলাওয়াত কর যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হয় এবং ছলাত কায়েম কর।" (সূরা আনকাবুত, আঃ ৪৫; সূরা মুজ্জাম্মিল, আঃ ২০; ছহীহ বুখারী ৬৩১)

৬। সাত স্থান দ্বারা সিজদা করা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।" (সূরা জীন, আঃ ১৮)

সাঈদ ইবনে জুবাইর এর মতে, মসজিদ বলতে যেসব অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে মানুষ সিজদা করে সেগুলো অর্থাৎ হাত, হাঁটু, পা ও কপাল বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতটির অর্থ হলো, সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ আল্লাহর তৈরী। এগুলোর সাহায্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা যাবে না। [কুরতুবী]

৭। ইমামের কেরাত পাঠ করার সময় মুক্তাদীর চুপ থাকা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এবং যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তা (চুপ করে মনযোগ দিয়ে) শ্রবণ কর।" (সূরা আরাফ, আঃ ২০৪)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেন, এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে যে, এই আয়াত ছলাত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (আল মুগনী, ১/৪৯০; নবীজীর ছলাত, পৃষ্ঠা-১৫৮)

৮। ছলাতের মাঝে তাশাহুদ পড়া ও বৈঠক করা।

হযরত রিফায়া বিন রাফি (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রছূল (ছাঃ) ছলাতে ভুলকারীকে আদেশ করলেন, যখন তুমি ছলাতের মাঝে বসবে, ধিরস্থীর ভাবে বসবে ও বাম উরু বিছিয়ে বসবে। তাঁরপার তাশাহুদ বলবে। (আবু দাউদ, হা: ৮৬০; বায়হাকী, ২/১৩৩)

জানা প্রয়োজন: উপরক্ত হাদিসটি যদিও তাশাহুদ ও বৈঠককেই ইঙ্গিত করছে, তবুও তা ছলাতের মধ্যেবর্তি তাশাহুদ ও বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা ছলাতে শেষ তাশাহুদ ও বৈঠক ছলাতের ফরয অধ্যায়ে উল্লেখ হয়েছে, মধ্যবর্তী তাশাহুদ ও বৈঠক ফরয হওয়া প্রসঙ্গে কোন দলিল নেই। তবে ছলাতের মধ্যবর্তী তাশাহুদ ও বৈঠক ভুলক্রমে না করলে সিজদায়ে শাহুর প্রয়োজন আর একথা প্রমাণিত যে, ছলাতের ওয়াজিব ছুটে গেলে সিজদায়ে শাহু দিতে হয়। কাজেই ছলাতের মধ্যবর্তী তাশাহুদ ও বৈঠক ওয়াজিব এর অন্তর্ভুক্ত। (ফিকহু সুন্নাহ, পৃষ্ঠা- ২২৪)

৯। দুই সিজদার মাঝে ধীরস্থির ভাবে বসা।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন প্রথম সিজদা হতে মাথা তুলতেন তখন শান্ত ও স্থির হয়ে না বসা পর্যন্ত দ্বিতীয় সিজদা করতেন না। (ছহীহ মুসলিম, হা: ৪৯৮)

অন্য এক হাদিছে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, ধীরস্থির ভাবে সিজদা করবে, তাঁরপর সিজদা হতে মাথা তুলবে এবং শান্ত ও স্থির ভাবে বসবে। পুনরায় ধীরস্থির ভাবে দ্বিতীয় সিজদা করবে। (ছহীহ বুখারী, হা: ৭৯৩)

■ ছলাতের সুন্নাত সমূহ ১৭ টি:

ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ছলাতের বাকী সব আমলই সুন্নাত। (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃষ্ঠা ৫২) ছলাতের সুন্নাত সমূহের কোন কিছু ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব

হয় না। (নবীজী (সঃ) নামাজ, পৃষ্ঠা ২১৮) ছলাতের সুন্নাত গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) মৌখিক ও (খ) কার্যাবলী

(ক) মৌখিক:

মৌখিক সুন্নাত সমূহ ৭টি।

১। ছলাতে কুরআন পাঠের পূর্বে বিসমিল্লাহ (পুরো) পড়া। (নবীজী (সঃ) নামাজ, পৃষ্ঠা-২১৯)

২। সূরা ফাতিহার পর অন্যান্য সূরা মিলানো। (মুসলিম, হা: ৪৫১)

৩। আমীন বলা। (বুখারী, হা:১/১০৮)

৪। রুকু-সিজদায় তিন বার তাসবিহ বলা। (জামে তিরতিযী, হা: ১/৩৬)

৫। দুই সিজদার মাঝে দু'আ পাঠ। (মুসলিম, হা:২৬৯৭)

৬। প্রথম ও শেষ তাশাহুদের পর নাবী (ছাঃ) এর উপর দুরূদ পাঠ। (ছহীহ ইবনে মাজাহ, হা: ১১৯১)

৭। সালাম ফিরানোর পর দু'আ ও যিকর। (ছহীহ মুসলিম, হা: ৫৯৭)

(খ) কার্যাবলী:

কার্যাবলী সুন্নাত সমূহ ১১টি।

১। ছলাতের জন্য সুতরাহ গ্রহণ করা। (ছহীহ ইবনে খুজাইমা, হা: ৮০৩)

২। তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত কান অথবা কাধ পর্যন্ত উঠানো। (জামে তিরমিযী, হা: ১/৩৩)

জানা প্রয়োজন: তাকবীর বলার সময় দুই হাত উপরে উঠানো সুন্নাত। হাত কেহ কানের লতি পর্যন্তও তুলতে পারে অথবা কাধ বরাবরও তুলতে পারে। হাত না উঠালেও ছলাত হয়ে যাবে। অতএব হাত কোন পর্যন্ত উঠাতে হবে সেটা নিয়ে মুসলমান মুসলমান দ্বন্দ্ব করা, হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা গোনাহের কাজ ও ঘৃণিত ব্যাপার। সুতরাং এই ব্যাপারটি নিয়ে যার নিকট যেই হাদিছটি শক্তিশালী হবে সে সেটাই আমল করবে।

৩। তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য তাকবীরের সময় রফউল ইয়াদাইন করা। (ছহীহ বুখারী, হা: ৪৯৩)

৪। ছলাতে হাত বাঁধা। (ছহীহ বুখারী, হা: ৭৪০)

জানা প্রয়োজন: ছলাতে হাত বাধা একটি সুন্নাত আমল। তা বুকের উপর বাধবে? বুকের মাঝে বাধবে? নাভির উপরে বাধবে? কি নাভির নিচে বাধবে। যার নিকট যেই হাদিছ শক্ত মনে হবে সেই ব্যাক্তি সেই হাদিছের উপরে আমল করবে, এ নিয়ে ধাক্কা-ধাক্কি করে জল ঘোলা করা গোড়ামী। আর যদিও হাত বাধা সুন্নাত। কিন্তু এই হাত বাধা নিয়ে মুসলমান মুসলমান মারা-মারি, ধাক্কা-ধাক্কি, উপহাস করা বা বিভক্তি হওয়া কাবিরাহ গোনাহ।

৫। রুকুতে দুই হাটুর উপর হাত রেখে রুকু করা। (আবু দাউদ, ১/১২৬)

৬। রুকু থেকে সোজা হয়ে দাড়ানো। (আবু দাউদ, ১/১২৬)

৭। কপাল, নাক ও দু'হাত মাটিতে রাখা আর দু'হাতকে, দু'পাজর থেকে দূরে রাখা। দু'হাতের তালুকে দু'কাধ অথবা দু'কান বরাবর রাখা।
দু'কনুই মাটি থেকে উচু করে রাখা, দু'পায়ের অগ্রভাগকে খাড়া করে রাখা, দু'পায়ের গোড়ালীকে পাশাপাশী মিলিয়ে রাখা এবং দু'হাত ও দু'পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে রাখা। (ছহীহ বুখারী, হা: ৮২৮, ৮০৭; ছহীহ মুসলিম, হা: ৪৯৪; তিরমিযী, হা: ২৭০; বাইহাকী, হা: ২৭১৯)

৮। ছলাতে সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা। (হাকেম, হা: ১৭৬১)

৯। তাশাহুদের সময় ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটবর্তী আঙ্গুল (শাহাদাত আঙ্গুলি) উত্তোলন করে রাখা। (ছহীহ মুসলিম, হা: ৫৮০)

১০। বৈঠকে ও তাশাহুদের সময় স্বীয় দৃষ্টিকে উত্তোলন রাখা আঙ্গুলটির দিকে রাখা। (নাসাঈ, হা: ১১৬০)

১১। ছলাতের ফরয সমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

■ ছলাত বিনষ্টের কারণ সমূহ ৫ টি:

যে কাজগুলো ছলাতরত অবস্থায় করলে ছলাত ভঙ্গ হয়ে যায়।

১। যে অপবিত্রতাঁর কারণে অযূ নষ্ট হয়ে যায়, তা ছলাতরত অবস্থায় নিশ্চিত ভাবে জানতে পারলে। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৩৭)

২। বিনা কারণে ছলাতের শর্তসমূহের মধ্যে থেকে কোন একটি শর্ত বাদ দেয়া অথবা ফরয সমূহের মধ্যে থেকে কোন একটি ফরয বাদ দেয়া। (ছহীহ বুখারী, হা: ৭৯৩)

৩। ছলাতরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে খাওয়া ও পান করা। (ফিকহুস সুন্নাহ, হা: ২৮৩)

৪। ছলাতে সংশোধন করা ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে কথা বলা। (ছহীহ বুখারী, হা: ১২০০)

৫। ছলাতরত অবস্থায় মুচকি হাসি ব্যতীত উচ্চস্বরে হাসি দেয়া। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা: ৩৭৭৪)

■ ছলাত আদায়ের কিছু ছোট সূরাহ সমূহ:

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾

অর্থ: "পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲﴾

অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।"

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۳﴾

অর্থ: "দয়াময়, পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۴﴾

অর্থ: "বিচার দিবসের মালিক।"

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿۵﴾

অর্থ: "আপনারই আমরা ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই।"

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۶﴾

অর্থ: "আমাদেরকে সরল পথ দেখান। পথের হিদায়াত দিন।"

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

অর্থ: "তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন। যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।"

সূরা ফিল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ: "পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।"

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿۱﴾

অর্থ: "তুমি কি দেখনি তোমার রব হাতীওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন।"

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ﴿۲﴾

অর্থ: তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেননি?"

وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿۳﴾

অর্থ: "আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন।"

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿۴﴾

অর্থ: "তারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করে পোড়ামাটির কঙ্কর।"

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿۵﴾

অর্থ: "অতঃপর তিনি তাদেরকে করলেন ভক্ষিত শস্যপাতাঁর ন্যায়।"

সূরা কুরাইশ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ: "পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।"

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿۱﴾

অর্থ: "যেহেতু কুরাইশ অভ্যস্ত"

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ﴿۲﴾

অর্থ: "শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তারা অভ্যস্ত হওয়ায়।"

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿۳﴾

অর্থ: "অতএব তারা যেন এ গৃহের রবের ইবাদত করে,"

ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ﴿٤﴾

অর্থ: “যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দিয়েছেন আর ভয় থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।”

সূরা মাউন

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿﴾

অর্থ: “পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।”

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾

অর্থ: “তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব-প্রতিদানকে অস্বীকার করে?”

فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾

অর্থ: “সে-ই ইয়াতীমকে কটোরভাবে তাড়িয়ে দেয়,”

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

অর্থ: আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।”

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾

অর্থ: “অতএব সেই ছলাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ,”

ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

অর্থ: “যারা নিজদের ছলাতে অমনোযোগী,”

ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾

অর্থ: “যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে,”

وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

অর্থ: “এবং ছোট-খাট গৃহসামগ্রী দানে নিষেধ করে।”

সূরা ইখলাস

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

অর্থ: “পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।”

﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾

অর্থ: “বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়

﴿ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾

অর্থ: “আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।”

﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴾

অর্থ: “তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।”

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴾

অর্থ: “আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।”

■ ছলাতের প্রয়োজনীয় দু’আ সমূহ:

১। ছানা। (ছহীহ মুসলিম, হা: ৩৯৯)

২। রুকুর তাসবীহ।

৩। সিজদার তাসবীহ। (সুনানে তিরমিযী, হা: ২৬২)

৪। দুই সিজদার মাঝখানে বসে পড়ার দু’আ। (ছহীহ মুসলিম, হা: ২৬৯৭; আবু দাউদ, হা: ৮৭৪)

৫। আত্তাহিয়াত। (ছহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী, হা: ৮৩১)

৬। দুরূদ। (ছহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী, হা: ৩৩৭০)

৭। দু’আয়ে মাসূরা। (ছহীহ বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী, হা: ৮৩৪)

ছলাতের পূর্বে পবিত্রতার বর্ণনা

ক) গোসল

■ গোসলের পরিচয়:

গোসল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধৌতকার্য সম্পন্ন করা। আভিধানিক অর্থে গোসল হলো, কোন বস্তুর উপর পানি প্রবাহিত করা। শরীয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট কোন কারণে সমস্ত শরীরে পবিত্র পানি প্রবাহিত করাকে গোসল বলা হয়। (কাশফুল কুফা, ১/১৮৫)

■ গোসলের প্রকারভেদ:

গোসল সাধারণত তিন প্রকার।

১। ফরয গোসল।

ফরয গোসল ঐ গোসলকে বলা হয় যা, করা অপরিহার্য্য। বালেগ বয়সে নাপাক হলে গোসল ফরয হয়। (ছালাতুর রাসূল ছঃ, পৃ: ৬৪)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যদি তোমরা নাপাক হয়ে থাকো, তবে গোসল কর। (সূরা মায়েদাহ, আঃ ৬)

২। সুন্নাত গোসল।

সুন্নাত গোসল ঐ গোসলকে বলা হয় যা, অপরিহার্য্য নয় কিন্তু করলে নেকী আছে। (ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ২৯৪)

৩। সাধারণ গোসল।

সাধারণ গোসল ঐ গোসলকে বলা হয়, যা মানুষ সাধারণত নিজের ইচ্ছেমত যে কোন সময় করে থাকে। যেমন: ভারতীয় উপমহাদেশে এই গোসলটি প্রায় প্রতিদিনই দেওয়া হয়।

■ ফরয গোসল সমূহ ৪ টি:

যে সকল কারণে গোসল ফরয হয়।

১। সুস্থ অবস্থায়, ঘুমন্ত বা জাগ্রত থাকাকালীন সময়ে বীর্য নির্গত হলে। (ছহীহ মুসলিম, হা: ৩৪৩; আবু দাউদ, হা: ২০৬)

২। দুই যৌনাঙ্গের মিলন হলে, যদিও বীর্যপাত না হয়। (ছহীহ বুখারী, হা: ২৯১)

৩। হায়য।

৪। নিফাস। (ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ২৮৮)

■ সুন্নাত গোসল সমূহ ৭ টি:

১। দুই ঈদের গোসল করা। (বাইহাকী, ৩/২৭৮)

২। অজ্ঞান থেকে জ্ঞান ফিরার পর গোসল করা। (ছহীহ বুখারী, হা: ৬৮৭)

৩। হাজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বাঁধার সময় গোসল। (তিরমিযী, হা: ৮৩১)

৪। মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল। (বুখারী, হা: ১৫৭৩)

৫। একাধিকবার স্ত্রী সহবাসের মাঝে গোসল। (আবু দাউদ, হা: ২১৬)

৬। মৃত ব্যাক্তিকে গোসল করানোর পরে গোসল। (তিরমিযী, হা: ৯৯৩)

৭। জুম'আর ছলাতের জন্য গোসল। (ছহীহ মুসলিম, হা: ৮৫৭)

■ গোসলের ফরয সমূহ ৩ টি:

১। কুলি করা। (দারাকুতনী, ১/১১৫)

২। নাকে পানি দেয়া। (দারাকুতনী, ১/১১৫)

৩। সমস্ত শরীর ভালো ভাবে ধৌত করা। (মুসনাদে আহমাদ, ১৬৭৪৯; ছহীহ বুখারী, হা: ২৫৪; মুসলিম, হা: ৩২৭)

■ গোসলের সুন্নাত সমূহ ১১ টি:

১। পাত্রে হাত প্রবেশের পূর্বেই বা গোসল শুরু করার পূর্বেই দু'হাত ২/৩ বার ধৌত করা। (ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ২৯৯)

২। বাম হাত দ্বারা গুপ্তাঙ্গ এবং তাতে যে ময়লা লেগে আছে তা ধৌত করা। (ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ২৯৯)

৩। গুপ্তাঙ্গ ধৌত কারার পর সাবান বা এ জাতীয় কিছু, যেমন- মাটি ইত্যাদি দ্বারা হাত পরিস্কার করা। (ছহীহ মুসলিম, ৩১৭; ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ৩০০)

৪। ছলাতের অযূর ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ভাবে অযূ করা। (ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ৩০০; ছহীহ নাসাঈ, হা: ২৪৭)

৫। মাথার উপর ৩ বার পানি ঢালা, যেন চুলের গোঁড়ায় পানি পৌছে যায়। (ছহীহ বুখারী, হা: ২৪৭)

৬। প্রথমে মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধুয়ে ফেলা। (ছহীহ বুখারী, হা: ২৭৭)

৭। সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুলগুলো খিলাল করা। (ছহীহ বুখারী, হা: ২৭২/নাসাঈ, হা: ৪২০)

৮। (পুরুষের জন্য) দাড়ি খিলাল করা। (ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ৩০৬)

জানা প্রয়োজন: গোসলের সময় মহিলাদর মাথার চুলের বেনি খোলার প্রয়োজন নেই। (ছহীহ মুসলিম, হা: ৩৩১)

৯। শরীর ভালো ভাবে কচলানো এবং ধৌত করা। (ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ৩০৭)

১০। সারা শরীরে পানি ঢালা প্রথমে ডান দিকে পরে বাম দিকে। (বুখারী, হা: ১৬৮)

১১। গোসল সমাপ্ত হলে দু’পায়ে পানি ঢেলে ধৌত করা। (ছহীহ বুখারী, হা: ২৬০)

■ ফরয গোসলের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম:

“যে ভাবে ফরয গোসল করবেন”

ফরয গোসলের প্রয়োজন হলে- প্রথমে মনে মনে গোসলের নিয়ত বা সংকল্প করে নিবেন। অতঃপর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবেন। তাঁর পর বাম হাতে পানি ঢেলে স্বীয় লজ্জাস্থান ও তাঁর পার্শ্ববর্তী স্থান ভালো ভাবে পরিস্কার করবেন। অতঃপর উক্ত বাম হাতটি মাটি বা সাবান দিয়ে ভালো ভাবে ধৌত করে নিবেন। অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে ছলাতের অযূর ন্যায় পূর্ণাঙ্গ অযূ করবেন। তাঁরপর মাথার চুলে তিন বার পানি ঢালবেন এবং ভালোভাবে মাথার চুল খিলাল করবেন। যেন পানি সমস্ত মাথায় ভালো ভাবে পৌছতে পারে। মাথায় ডান দিক থেকে পানি ঢালবেন পরে বাম দিক থেকে পানি ঢালবেন। অতঃপর সমস্ত শরীরে ভালো ভাবে পানি ঢালবেন এবং (পুরুষ) তাঁর দাড়ি ভালো ভাবে খিলাল করে নিবেন। সমস্ত শরীর ভালো ভাবে কচলিয়ে নিবেন। এমন ভাবে গোসল করবেন যেন, সমস্ত শরীরের সকল স্থানেই পানি পৌছে।

অতঃপর গোসল সমাপ্ত হলে ২/৩ ধাপ দূরে সরে দুই পায়ে পানি ঢেলে ভালো ভাবে ধৌত করে নিবেন।

জানা প্রয়োজন: নারী-পুরুষের ফরয গোসলের নিয়ম একই রকম। তবে ফরয গোসলের সময় যদি নারীদের চুল বাধা থাকে বা বেনী করা থাকে তাহলে চুল খুলা জরুরী নয়। (ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ৩০৮) গোসলের পর ছলাতের জন্য আর পৃথক অযুর প্রয়োজন নেই। যদি অযু নষ্ট না হয়ে থাকে। (সুনানে তিরমিযী, হা: ১০৭)

■ হায়য ও নিফাসের কারণে মহিলাদের গোসল:

ক) হায়েয অর্থাৎ মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব যা সাবালিকা মহিলাদের প্রতি মাসেই হয়ে থাকে। মহিলাদের এ অবস্থাটি হল নাপাকীয় অবস্থা। অতএব এই সময়টিতে তারা ছলাত আদায় করবে না। (নবীজীর (সঃ) নামায, পৃ: ১০৭)

খ) নিফাস অর্থাৎ সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত আসে তাকে নিফাস বলে। নিফাসের দিনগুলোতে সেই বিধি-নিষেধই আরোপিত হয় যা মাসিকের দিনগুলোতে হয়। নিফাসের সর্বনিম্ন সময় নির্ধারিত নেই। তাই রক্ত বন্ধ হলেই গোসল করে নামায পড়তে হবে। নিফাসের সর্বোচ্চ সময় হলো চল্লিশ (৪০) দিন। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি রক্ত বন্ধ না হয় তাহলে বাড়তি দিনগুলো নিফাসের মধ্যে গণ্য হবে না। (নবীজীর (সঃ) নামায, পৃ: ১০৯)

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর সময় প্রসূতিরা (সর্বোচ্চ) চল্লিশ দিন পর্যন্ত শরীয়তের নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত থেকে মুক্ত থাকত। (জামে তিরমিযী, হা: ১/২০)

■ মহিলাদের জানাবাতের (অর্থাৎ সহবাসের কারণে অপবিত্রতা) গোসল, হায়েয ও নিফাসের গোসলের মধ্যে পার্থক্য:

হায়য ও নিফাসের গোসল জানাবাতের (ফরয) গোসলের মতই। তবে এক্ষেত্রে বাড়তি কিছু কাজ রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

মহিলাগণের হায়য ও নিফাস হলে জানাবাতের অর্থাৎ ফরয গোসলের মতই গোসল করবে, শুধু তারা গোসলের পূর্ণাঙ্গ অযুর পর মাথায় যখন পানি ঢালবে তখন চুলে খোপা বা বেনী থাকলে তা খুলে দিবে এবং মাথার চুলগুলো উত্তম রূপে ঘষে ঘষে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছাবে এবং সারা শরীরে ভালো ভাবে পানি ঢালবে। অতঃপর গোসল শেষে এক টুকরা তুলাতে মেশক বা আতর

কিংবা অনুরূপ সুগন্ধি কোন কিছু লাগিয়ে তুলার টুকরাটি দিয়ে রক্তের চিহ্নিত স্থান থেকে রক্তের চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। অতঃপর রক্তগুলো ভালোভাবে মুছে যাওয়ার জন্য এমন ভাবে সুগন্ধি লাগাতে হবে যেন, দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায় এবং সুগন্ধি যুক্ত হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আসমা (রাঃ) নাবী ﷺ কে ঋতুর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমরা কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢালবে এবং উত্তম রূপে ঘষে ঘষে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌছাবে এবং সারা শরীরে পানি ঢেলে দিবে। পরে কস্তুরী মাখানো এক টুকরো কাপড় দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করবে। একথা শুনে আসমা (রাঃ) বললেন, কস্তুরী মাখানো বস্ত্র দ্বারা কিরূপে পবিত্রতা হাসিল করবো? তখন নাবী ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি তা দিয়েই পবিত্রতা হাসিল করবে। আয়শা (রাঃ) চুপিসারে তাকে বললেন, রক্ত চিহ্নিত স্থানে উক্ত (কস্তুরী মিশ্রিত) কাপড় দ্বারা ঘষে ঘষে মুছে ফেলো। (ছহীহ বুখারী, হা: ৩১৪)

খ) অযু

অযুর আভিধানিক অর্থ পরিছন্নতা ও উজ্জলতা। শরীয়তের অর্থে ছলাত অথবা অনুরূপ ইবাদত থেকে বাধা প্রদান করে, এমন অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা মুখ, দু'হাত, মাথা ও দু'পায়ে পানি ব্যবহার করে ধৌত করার নাম অযূ।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তির বায়ু নির্গত হয়, তাঁর ছলাত হবে না যতক্ষণ না সে অযু করে।' (ছহীহ বুখারী, হা: ১৩৫)

■ অযুর ফাযিলাত:

১। অযু ছোট-ছোট পাপ গুলো মোচন করে। (ছহীহ মুসলিম, হা: ২৪৪; ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ১৯৫)

২। অযুর দ্বারা বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। (ছহীহ মুসলিম, হা: ২৫১; ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ১৯৬)

৩। জান্নাত যাওয়ার পথ সুগম হয়। (ছহীহ বুখারী, হা: ১১৪)

৪। এটা এমন একটা নিদর্শন যার দ্বারা হাউজে কাওসারের নিকট উপস্থিত হওয়ার সময় উম্মাতকে পৃথক করা হবে। (ছহীহ মুসলিম, হা: ২৩৪)

৫। অযু কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য জ্যোতি স্বরূপ। (ছহীহ মুসলিম, হা: ২৫০)

৬। অযু শয়তানের দেয়া গিট্টু বা গ্রন্থি খুলে দেয়। (ছহীহ বুখারী, হা: ১১৪২)

■ অযুর ফরয সমূহ ৪ টি:

১। সমস্ত মুখমণ্ডল ভালো ভাবে ধৌত করা। (সূরা মায়িদা, আঃ ৬)

২। দু'হাত কনুই পর্যন্ত ভালো ভাবে ধৌত করা। (সূরা মায়িদা, আঃ ৬)

৩। মাথা মাসেহ করা। (সূরা মায়িদা, আঃ ৬)

৪। দু'পা টাখনু পর্যন্ত ভালো ভাবে ধৌত করা। (সূরা মায়িদা, আঃ ৬)

■ অযুর সুন্নাত সমূহ ১৩ টি:

১। অযুর শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলা। (আবু দাউদ, হা: ১০১)

২। অযুর শুরুতে দু'হাত কব্জিসহ ধৌত করা। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৫৯)

৩। তিন বার কুলি করা (ছহীহ মুসলিম, হা: ২৩৫)

৪। তিন বার নাকে পানি দেওয়া। (ছহীহ মুসলিম, হা: ২৩৫)

৫। দাড়ি খিলাল করা। (জামে তিরমিযী, ১/৬)

৬। আঙ্গুল খিলাল করা। (জামে তিরমিযী, ১/৭)

৭। বাম হাতের পূর্বে ডান হাত ধৌত করা। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৪০)

৮। কান মাসেহ করা। (জামে তিরমিযী, ১/৭)

৯। পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯৮)

১০। অযুর অঙ্গগুলো ১/২/৩ বার ধৌত করা। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৫৬, ১৫৭; ছহীহ মুসলিম, ১/১২০)

১১। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগেই অন্য অঙ্গ ধৌত করা অর্থাৎ অযুর কাজগুলোর মধ্যে বিরতি না দেওয়া। (নবীজীর (সঃ) নামায, পৃ: ১১৪)

১২। অযু শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করা। (ছহীহ মুসলিম, ১/২২২)

১৩। ছিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্যরা ভালোভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি দেবে। (ছহীহ আবু দাউদ, হা: ১৪২)

■ অযু ভঙ্গের কারণ সমূহ ৭ টি:

১। মলমুত্র ত্যাগ করলে অযু নষ্ট হয়ে যায়। (সূরা মায়িদা, আঃ ৬)

২। বায়ু ত্যাগ করলে অযু নষ্ট হয়ে যায়। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৩৫)

৩। ওদি (পেশাব বা পায়খানা করার সময় পুরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ বের হয়) ও মযি (কাম উত্তেজনা বশত পুরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ বের হয়)। (ছহীহ বায়হাকী, হা: ৮০০)

৪। গভীর ঘুমে থাকা ব্যক্তি। (সুনানে তিরমিযী, ১/১৪)

৫। মুখ ভরে বমি হলে কিংবা নাক দিয়ে রক্ত পড়লে অযু নষ্ট হয়ে যায়। (জামে তিরমিযী, ১/১৩; মুজামে তাবারানী, হা: ১১৩৭৪)

৬। উটের গোস্ত খেলে অযু নষ্ট হয়ে যায়। (ছহীহ মুসলিম, হা: ৩৬০)

৭। মহিলাদের ইস্তিহাযার রক্ত আসলে অর্থাৎ মাসিক ঋতুস্রাব ব্যতীতও অধিক সময় রক্ত পড়ার কারণে অযু নষ্ট হয়ে যায়। (ছহীহ বুখারী, ১/৩৬)

গ) তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প করা। শারঈ অর্থ- অযু ও গোসলকে বৈধ করে এমন নাপাকির থেকে পবিত্রতাঁর নিমিত্তে মাটির উপর হাত বুলানোর ইচ্ছা করাকে তায়াম্মুম বলা হয়। (সূরা বাকারাহ, আঃ ২৬৭)

■ যে সকল অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ:

১। পানি পাওয়া না গেলে। (সূরা মায়িদা, আঃ ৬)

২। পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকলে। (সূরা মায়িদা, আঃ ৬)

অযু ও গোসলের বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুম করতে হয়। সফরে থাকা অবস্থায় হোক কিংবা বাড়িতে থাকা অবস্থাতেই হোক, উপরোক্ত দুইটি কারণের একটি উপস্থিত হলেও তায়াম্মুম করা বৈধ। (সূরা মায়িদাহ, আঃ ৬)

■ তায়াম্মুমের বিশুদ্ধ পদ্ধতি:

প্রথমে পবিত্র মাটির উপর একবার দুই হাত মারবে, তাঁরপর দু'হাত ফুঁক দিয়ে ঝেড়ে ফেলবে। এরপর মুখমণ্ডল ও দুই হাত কব্জি পর্যন্ত বুলাবে। (ছহীহ বুখারী, হা: ৩৩৮)

জানা প্রয়োজন: তায়াম্মুমের জন্য দু'বার হাত মাটিতে মারার কথাও হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত। এবং তায়াম্মুমের সময় দুই হাত কনুই ও বগল পর্যন্ত মাসেহ করার কথাও হাদিছে রয়েছে। সুতরাং, হাত একবার মারা বা দুইবার মারা, কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করা, কিংবা কনুই বা বগল পর্যন্ত মাসেহ করা নিয়ে মুসলমান-মুসলমান ধাক্কা-ধাক্কি করে গোনহগার হওয়া যাবে না।

■ তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ সমূহ:

যে সমস্ত কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়, সে সমস্ত কারণেই তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

ইসলামের ৫ টি বুনিয়াদ বা স্তম্ভের মধ্য হতে দুইটি (কালিমা, ছলাত) এর আলোচনার মাধ্যমে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইলো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামানে পাঠাচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন, তুমি এমন এক গোত্রের কাছে যাচ্ছো যাদের উপর কিতাব নাযিল হয়েছিলো। তুমি তাদেরকে প্রথমে আহবান করবে এ কথার সাক্ষ্য দিতে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রসূল ﷺ। তারা যদি এটা মেনে নেয়, তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত ফরয করেছেন। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৪৯৬)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৩. যাকাত

■ যাকাতের অর্থ:

যাকাত অর্থ বরকত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্র হওয়া ও সংশোধন। (ফিকহুস সুন্নাহ, পৃ: ১১)

যাকাতের আভিধানিক অর্থ- কোন কিছু বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিরিক্ত হওয়া। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড পৃ: ১১)

যাকাতের শারঈ অর্থ- নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গৃহীত সম্পদ, যেগুলোকে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা হয়। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড পৃ: ১১; আল মাজমূ, আন-নভভী প্রণীত, ৫/৩২৪)

■ আয়াত:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আপনি তাদের সম্পদরাজি থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যাতে এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র এবং সংশোধন করতে পারেন।' (সূরা তাওবাহ, আঃ ১০৩)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তোমরা ছলাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর।' (সূরা বাকারাহ, আঃ ১১০)

■ দ্বীন ইসলামে যাকাতের অবস্থান:

যাকাত হলো একটি ফরয ইবাদত। যাকাত ইসলামের ৫ টি স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ প্রতি ঈমান এবং ছলাতের পরই যাকাতের স্থান। যাকাত আদায়ের জন্য ছাহাবীগণ (রাঃ) আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট বিশেষ ভাবে বায়াত গ্রহণ করেছেন।

■ হাদিস:

হযরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর হাতে শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করেছি ছলাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায় এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হিতাকাঙ্খী হবো, এ কথার উপরে। (ছহীহ বুখারী, হা: ৫৭)

■ যাকাতের ফাযিলাত ও উপকারিতা ১৩ টি:

১। যাকাত আদায় করা জান্নাতী লোকদের সৎগুণ সমূহের মধ্যে অন্যতম গুণ।

২। যাকাত আদায় করা ঐ সকল মু'মিনের গুণ যারা আল্লাহর দয়ার অধিকারী। (সূরা তাওবাহ, আঃ ৭১)

৩। আল্লাহ তা'য়ালা যাকাত আদায় কারীর সম্পদে প্রবৃদ্ধি ও বরকাত দান করেন। (সূরা বাকারাহ, আঃ ২৭৬)

৪। আল্লাহ তা'য়ালা যাকাত আদায়কারীকে কিয়ামাতের দিন তাঁর ছায়ায় স্থান দিবেন। (ছহীহ বুখারী, হা: ৬৬০)

৫। যাকাত সম্পদকে বৃদ্ধি করে ও যাকাত দাতাঁর জন্য রিযিকের দরজা খুলে দেয়। (ছহীহ মুসলিম, হা: ২৫৮৮)

৬। যাকাত রিযিকের প্রশস্ততাঁর কারণ এবং যাকাত না দেয়া রিযিকের সংকীর্ণতাঁর কারণ। (ইবনু মাজাহ, হা: ৪০১৯)

৭। যাকাত আদায় ভুল-ত্রুটি এবং গোনাহ মাফের কারণ। (তিরমিযী, হা: ৬১৪)

৮। যাকাত আদায় করা সঠিক ঈমানের চিহ্ন। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬)

৯। যাকাত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধন করে এবং তাঁর মনকে উদার করে। (যাদুল মা'আদ, ইমাম ইবনু কাইয়্যুম (রহিঃ) ২/২৫)

১০। যাকাত সম্পদকে রক্ষা করে, দারিদ্রের প্রাদুর্ভাব রোধ করে, আর পাপীদের ক্ষমতাঁর সম্প্রসারণ প্রতিরোধ করে। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬)

১১। দরিদ্র এবং অসহায়দের সহযোগিতা করে। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬; আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ২/৭৩২)

১২। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে একজন মুসলিম ব্যক্তির সামাজিক দ্বায়িত্ব পালন করা হয়, যেমন- প্রয়োজনের সময় ইসলামী রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করা, সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা, শত্রুর পথ রুখে দেওয়া এবং সাধ্য অনুযায়ী দরিদ্রদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ২/৭৩২)

১৩। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদের নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬; আযযাখীরা-ক্বরাফী প্রনীত, ৩/৭)

■ যারা যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকে তাদের বিধান ও শাস্তি:

যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিদের শাস্তি ২টি-

(১) ইহকালীন শাস্তি ও (২) পরকালীন শাস্তি।

১। ইহকালীন শাস্তি:

১.১। আল্লাহ প্রদত্ত নির্দিষ্ট শাস্তি। (ফিকাহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮; ফিকাহ যাকাত, ১/৯২)

আল্লাহ প্রদত্ত ইহকালীন শাস্তি ২ টি:

(ক) আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দিয়ে শাস্তি দেন। (বাইহাকী, ৩/৩৪৬)

(খ) আল্লাহ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেন। (মুজামুল কাবীর, ইমাম তাবারানী (রহিঃ), হা: ১০৯৯২)

১.২। ইসলামী শরীয়ত প্রদত্ত শাস্তি।

ইসলামী শরিয়াত প্রদত্ত শাস্তি আবার ২ টি:

(ক) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসক, যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়েছে এমন ব্যক্তির নিকট থেকে জোর পূর্বক তাঁর যাকাতের অংশ বের করে নিবে। (ফিকাহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:১৮; ছহীহ বুখারী, হা: ১৩৯৯)

(খ) যখন যাকাত দিতে না চাইবে তখন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসক তাঁর সাথে যুদ্ধ করবে। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৩৯৯)

২। পরকালীন শাস্তি:

২.১। যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তির পরকালীন শাস্তি:

(ক) এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। (সূরা তাওবাহ, আঃ ৩৪)

(খ) তাদের ললাট-পিঠ-পেট আগুনে পোড়ানো হবে। (সূরা তাওবাহ, আঃ ৩৫)

(গ) কিয়ামতের দিন তাঁর সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তাঁর মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। (ছহীহ বুখারী, হাঃ ১৪০৩)

(ঘ) কিয়ামতের দিন তাদের মাল-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে গরম করে গাত তৈরি করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের দেহের উভয় দিকে ও ললাটে দাগ দেওয়া হবে। (ছহীহ মুসলিম, হা ৯৮৭) এই দুইটা এই হাদিস।

(ঙ) আর যেসব উটের মালিকেরা যাকাত আদায় করে না, তাদেরকে একটি মাঠে উপর করে শুইয়ে রাখা হবে এবং ঐ সকল মালিকের দেহের উপর দিয়ে সেই উটগুলো মাড়াতে মাড়াতে পার হবে।

(চ) আর যেসব ছাগলের মালিকেরা তাঁর যাকাত আদায় করবে না, তাদেরকে একটি সমতল মাঠের উপর করে ফেলে রাখা হবে এবং তাঁর সেই ছাগল গুলো মোটা-তাজা অবস্থায় এসে তাদের পায়ের খুর দিয়ে ঐ মালিককে দলিত করতে থাকবে এবং তা দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। (ছহীহ মুসলিম, হা: ৯৮৭)

(ছ) উপরে উল্লেখিত ঘ থেকে চ পর্যন্ত শাস্তিগুলো এমন একদিন করা হবে যা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বছরের সমান। অতঃপর কেউ তাঁর কেউ পথ ধরবে জান্নাতের দিকে, কেউ পথ ধরবে জাহান্নামের দিকে। (ছহীহ মুসলিম, হা: ৯৮৭)

■ যাকাত আদায় হওয়ার শর্ত সমূহ ২ টি:

১) যাকাত দাতাঁর প্রযোজ্য শর্ত পূর্ণ হওয়া।

২) সম্পদের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূর্ণ হওয়া।

১। যাকাত দাতাঁর জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী আবার ২ টি:

১.১। স্বাধীনতা। অর্থাৎ, যাকাত দিতে হলে যাকাত দাতাকে স্বাধীন হতে হবে, দাস বা গোলামের উপর যাকাত ফরয হবে না। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২২; ছহীহ বুখারী, হা: ২৩৭৯)

জানা প্রয়োজন: এখানে দাস বা গোলাম বলতে সেই সকল গোলাম বা দাসকে বুঝানো হচ্ছে- যা মালিকের নিকট বিক্রি বা চুক্তিবদ্ধের মাধ্যমে থাকে বা রাখা হয়। কিংবা যুদ্ধে পরাজয় হবার মধ্যে কোন এক মালিকের নিকট দাস বা গোলাম হয়ে থাকে। সেই সকল গোলাম বা দাসকে বুঝানো হয়েছে, যা পূর্বে ছিলো। এটা বর্তমান সময়ের চাকরিজীবীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

১.২। ঈমান আনয়নকারী বা মুসলিম হওয়া। অর্থাৎ, অমুসলিমদের উপর যাকাত ফরয নয়। যতক্ষন পর্যন্ত অমুসলিম ঈমান আনয়ন করে মুসলমান না হবে, ততক্ষণ তাঁর উপর যাকাত ফরয নয়। (সূরা তাওবাহ, আঃ ৫৪)

২। যাকাত ফরয হবার ক্ষেত্রে সম্পদের উপর প্রযোজ্য শর্তাবলী পূর্ণ হওয়া:

২.১। সম্পদ ফরয হয় এ ধরনের সম্পদ হওয়া। অর্থাৎ যে সকল সম্পদের উপর যাকাত দেওয়া ফরয এ ধরনের সম্পদ হতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫)

২.২। নিসাব পূর্ণ হওয়া।

নিসাব, শরীয়াত নির্ধারিত একটি পরিমাণ। যে পরিমাণ পূর্ণ হলে যাকাত দেওয়া আবশ্যকীয়। আর পূর্ণ না হলে যাকাত দিতে হবে না। সম্পদ হিসেবে এ পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫)

২.৩। সম্পদে পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকা। (সূরা তাওবাহ, আঃ ১০৩; ছহীহ বুখারী, হা: ১৩৯৫)

২.৪। মালিকের কাছে ঐ সম্পদের মালিকানার উপর পূর্ণ এক বছর (হিজরী সন) অতিক্রান্ত হওয়া। এটা শুধু স্বর্ণ, রৌপ্য (অর্থ) ও মাঠে চড়ে বেড়ায় বা খায় এমন পশুর যাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ক্ষেত ও ফল-ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে নয়। ক্ষেত ও ফল-ফসলের ক্ষেত্রে শর্তগুলো- তা পরিপক্ক হতে হবে ও পূর্ণতা লাভ করতে হবে।

■ যাকাত দাতা বা যারা যাকাত দিবে:

১) যেই ব্যক্তির নিকট সাড়ে সাত তোলা বা তাঁরও বেশি সোনা রয়েছে, তা পরিধেয় হোক বা শখের জন্য হোক কিংবা এমনিতেই জমা রাখা হোক। তাকে সেই সোনার ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা অর্থ হিসাব করে ৪০ ভাগের ১ ভাগ অর্থ যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩২, টিকা: ৪৯)

২) যেই ব্যক্তির নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা তাঁরও বেশি পরিমাণ রূপা রয়েছে; তা পরিধেয় হোক কিংবা এমনিতেই জমা রাখা হোক, তাকে সেই রূপার ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা অর্থ হিসাব করে ৪০ ভগের এক ভাগ অর্থ যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩২, টিকা ৪৯)

৩) যেই ব্যক্তির নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা তাঁরও বেশি পরিমাণ রোপা ক্রয় করার মত নগদ অর্থ রয়েছে, তাকে সেই অর্থের ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩২, টিকা ৪৯; ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৩২; আল মাওসূয়া ফিক্কহিয়্যা ২৩/২৬৭)

৪) যেই ব্যক্তির নিকট ৫ থেকে ৯ টি পর্যন্ত উট রয়েছে তাকে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

৫) যেই ব্যক্তির নিকট ১০ থেকে ১৪ টি পর্যন্ত উট রয়েছে তাকে দুটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

৬) যেই ব্যক্তির নিকট ১৫ থেকে ১৯ টি উট রয়েছে তাকে তিনটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

৭) যেই ব্যক্তির নিকট ২০ থেকে ২৪ টি উট রয়েছে তাকে চারটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

৮) যেই ব্যক্তির নিকট ২৫ থেকে ৩৫ টি উট রয়েছে তাকে এক বছর বয়সের একটি উটনি যাকাত দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

৯) যেই ব্যক্তির নিকট ৩৬ থেকে ৪৫ টি উট রয়েছে তাকে দুই বছর বয়সের একটি উটনি যাকাত দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

১০) যেই ব্যক্তির নিকট ৪৬ থেকে ৬০ টি উট রয়েছে তাকে তিন বছর বয়সের একটি উটনি যাকাত দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

১১) যেই ব্যক্তির নিকট ৬১ থেকে ৭৫ টি উট রয়েছে তাকে চার বছর বয়সের একটি উটনি যাকাত দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

১২) যেই ব্যক্তির নিকট ৭৬ থেকে ৯০ টি উট রয়েছে তাকে দুই বছর বয়সের দুটি উটনি যাকাত দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

১৩) যেই ব্যক্তির নিকট ৯১ থেকে ১২০ টি উট রয়েছে তাকে তিন বছর বয়সের দুটি উটনি যাকাত দিতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

অতঃপর উট ১২০ টির বেশি হলে আবার নতুন ভাবে গণনা শুরু করা যাবে।

■ গরুর নিসাব:

১৫) যেই ব্যক্তির নিকট ৩০ টি থেকে ৩৯ টি গরু রয়েছে তাকে একটি এক বছরের গাভী অথবা ষাঁড় যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

১৬) যেই ব্যক্তির নিকট ৪০ টি থেকে ৫৯ টি পর্যন্ত গরু রয়েছে তাকে একটি দুই বছরের গাভী যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

১৭) যেই ব্যক্তির নিকট ৬০ টি থেকে ৬৯ টি পর্যন্ত গরু রয়েছে তাকে দুটি এক বছরের গাভী অথবা ষাঁড় যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

১৮) যেই ব্যক্তির নিকট ৭০ টি থেকে ৭৯ টি পর্যন্ত গরু রয়েছে তাকে একটি এক বছরের গাভী অথবা ষাঁড় অথবা একটি দুই বছরের গাভী যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

১৯) যেই ব্যক্তির নিকট ৮০ টি থেকে ৮৯ টি পর্যন্ত গরু রয়েছে তাকে দুটি দুই বছরের গাভী যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

২০) যেই ব্যক্তির নিকট ৯০ থেকে ৯৯ টি পর্যন্ত গরু রয়েছে তাকে তিনটি এক বছরের গাভী অথবা ষাঁড় যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

২১) যেই ব্যক্তির নিকট ১০০ টি থেকে ১০৯ টি পর্যন্ত গরু রয়েছে তাকে দুটি এক বছরের গাভী অথবা ষাঁড় অথবা একটি দুই বছরের গাভী যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

■ ছাগলের নিসাব:

২২) যেই ব্যক্তির নিকট ৪০ টি থেকে ১২০ টি পর্যন্ত ছাগল রয়েছে তাকে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

২৩) যেই ব্যক্তির নিকট ১২১ টি থেকে ২০০ টি পর্যন্ত ছাগল রয়েছে তাকে দুটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

২৪) যেই ব্যক্তির নিকট ২০০ টি থেকে ৩৯৯ টি পর্যন্ত ছাগল রয়েছে তাকে তিনটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

২৫) যেই ব্যক্তির নিকট ৪০০ টি থেকে ৪৯৯ টি পর্যন্ত ছাগল রয়েছে তাকে চারটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

২৬) যেই ব্যক্তির নিকট ৫০০ টি থেকে ৫৯৯ টি পর্যন্ত ছাগল রয়েছে তাকে পাঁচটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ্ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮)

■ জানা প্রয়োজন:

ছাগলের যাকাতের ক্ষেত্রে ছাগল, ভেড়া, নর-মাদি যে কোন একটি আদায় করলেই শুদ্ধ হবে। (ছহীহ্ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯)

যাকাত দাতা শিরোনামের ১ নং পয়েন্ট থেকে ২৭ নং পর্যন্ত প্রতিটি পয়েন্টের যাকাতের সম্পদ তাঁর মালিকের নিকট (হিজরীসন) ১ বছর অতিক্রান্ত হতে হবে, তবেই যাকাত ওয়াজিব হবে।

মানুষ বপন করার পর ভূমি যা উৎপন্ন করে সবগুলোতেই যাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ ধান, গম, জব, বাদাম, কিসমিস, আলু, পেস্তা, খেজুর, ডালিম, জলপাই ইত্যাদি। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ:৬৯; আল-মুহাল্লা, ৫/২১২; হিদায়াহ ২/৫০২)

■ আয়াত:

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্বীয় উপার্জন থেকে এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করোনা। (সূরা বাকারাহ, আঃ ২৬৭)

■ ফল ও ফসলে যাকাত দেওয়ার সময়:

ফসল পরিপক্ক বা পেকে যাবার পর শস্য যেমন- ধান, গম, মশুর, সরিষা ইত্যাদি করার পর, অন্য ফসল কেটে পরিষ্কার করে ঘরে উঠানের সময় যাকাত দিতে হবে। এবং খেজুর বা ফল জাতিয় জিনিস পরিপক্ক বা পাকার পরেই যত দ্রুত সম্ভব যাকাত প্রদান করতে হবে।

■ ফসলের যাকাতের নিসাব বা পরিমাণ:

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, পাঁচের কম সংখ্যাক উটের যাকাত নেই, পাঁচ আওক্বিয়া (তর্থা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা) কম পরিমানের রূপার উপর যাকাত নেই, এবং পাঁচ ওয়াসাক এর কম পরিমানে যাকাত বা উশর নেই। (ছহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০০, হা: ১৪৪৭; ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৮)

অন্য এক হাদিসে নাবী ﷺ বলেন, শস্য এবং খেজুরের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত ওয়াজিব হবে না। (ছহীহ্ মুসলিম, হা: ৯৭৯)

৫ ওসাক = ১৬ মন ৭ কেজি, ৫ ওসাক আমাদের পরিচিত পরিমাণের দলিল। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭১) অর্থাৎ ১৬ মন ৭ কেজির বেশি পরিমাণ ফল-ফসলে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় দান করতে পারবে।

■ জানা প্রয়োজন:

ফসলের নিসাব বা পরিমাণ পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে দানা বিশিষ্ট ফসলকে পারস্পরিক মিলানো যাবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৩; আল মুগনী-২/৫৬০; মাজমূ ফাতাওয়া ২৫/২৩-২৪)

২৮) অর্থাৎ যেই ব্যক্তির নিকট ১৬ মণ ৭ কেজি বা তাঁরও বেশি উৎপাদিত ফল-ফসল রয়েছে তাকে সেই ফল-ফসলের প্রতি মনে বা ৪০ কেজিতে ৪ কেজি যাকাত দিতে হবে, যদি সেই ফল-ফসল আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করার কারণে হয়। আর যদি ব্যক্তির খরচে ভূমিতে সেচ দিয়ে ফসল হয় তবে প্রতি ৪০ কেজিতে ২ কেজি যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৪৮৩)

■ ব্যবসার জিনিসের যাকাত:

যে সমস্ত জিনিস ব্যবসা-বানিজ্যের জন্য নিদিষ্ট করা হয়েছে যেমন- জায়গা-জমি, খাদ্য-পানীয়, লোহা, গাড়ী, কাপড়, সোনা-রূপা, মনি-মুক্তা ইত্যাদি। দোকানে ছোট-বড় জিনিস যা আছে প্রত্যেক দোকানদারের উপর ওয়াজিব হচ্ছে এ সবের তালিকা উত্তমরূপে তৈরি করা, তাঁরপর হিসাব মতো যাকাত প্রদান করতে হবে। এই সকল পণ্যের যাকাতের অর্থ বের করার নিয়ম হলো- সাড়ে সাত তোলা খাঁটি সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের পরিমাণ ব্যবসার মাল থাকলে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ বুখারী ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩২, টিকা-৪৯; ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৪)

■ যাকাত দাতা যাদেরকে যাকাত দিতে পারবে তথা যাকাত গ্রহণকারী:

যাকাত ব্যয়ের খাত ৮ টি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যাকাত হলো শুধুমাত্র ফকীর, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্তাকর্ষন প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হলো আল্লাহর বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, আঃ ৬০)

অর্থাৎ, যাকাত ব্যয়ের খাত ৮ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে স্বতন্ত্রভাবে এই যাকাতের অংশ হজ্জ করতে যাওয়ার জন্য অর্থ নেই এমন ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১৭)

■ খাত সমূহ নিচে আবার উল্লেখ করলাম:

১। ফকীর।

২। মিসকিন।

৩। যাকাত আদায়কারী কর্মচারী।

৪। ঐ সকল ব্যক্তি; যাদের অন্তর আকর্ষণের প্রয়োজন।

এই খাতের ব্যক্তি দুই প্রকার:

ক) কাফের ও খ) মুসলমান

এবং এরা সবাই গোত্রের গ্রহণযোগ্য মান্য, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১০) এই খাতের মুসলমানদের মধ্যে যারা রয়েছে তারা আবার চার ধরনের।

(১) গোত্রের গ্রহণযোগ্য নেতৃবর্গ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদের অন্তর এখনও দুর্বল তাদের অন্তর শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে দেয়া হবে।

(২) এমন গোত্র যাদের সমাজে আলাদা সম্মান ও নেতৃত্ব রয়েছে এবং তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাদেরকে দেয়া হবে। যাতে তাদের মত অন্যান্য কাফেররা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়।

(৩) এ ধরনের নেতৃস্থানীয় লোকদের দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন তাদের তত্ত্বাবধানে যে সকল মুসলমান আছে তাদের রক্ষনাবেক্ষণ করে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।

(৪) এ ধরনের নেতৃস্থানীয় লোকদের দেয়ার উদ্দেশ্য- তারা যেন যারা যাকাত দেয় না তাদের থেকে যাকাত আদায় করে নেয়। ঐ খাতের যাকাত কাফের বা বিধর্মীদের ২ প্রকারকে দেয়া যায়।

(ক) যাদের ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আশা করা যায়। তাদেরকে দেয়া হবে যাতে তারা ইসলামের প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়।

(খ) যাদেরকে দিলে এই আশা করা যায় যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি বা অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১০-১১১; আল-মুগনী, ইবনু কুদামা, ২/৪৯৮)

৫। দাস মুক্তির জন্য।

৬। ঋণ গ্রস্তদের জন্য।

৭। আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য।

৮। মুসাফিরদের জন্য।

এই আটটি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে; তা ব্যতীত অন্য কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

■ সতর্কতা:

এই আট শ্রেণীর মানুষ ব্যতীতও আরো লোকদেরকে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে বা উঠাতে দেখা যায় এবং যাকাত দাতাও তাদেরকে যাকাতের অর্থ দিয়ে থাকে। এই আট শ্রেণী ব্যতীত অন্য কাউকে যাকাত দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা এবং মুহাম্মাদ ﷺ যাদেরকে যাকাত দিতে আদেশ করেছেন, তাদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে যাকাত দেয়া জায়েজ নেই, বরং আল্লাহর বিধান অমান্য করার শামীল হবে। কুরআনে বর্ণিত সূরা তাওবাহর ৬০ নং আয়তটি বার বার পড়ে দেখুন এবং বুঝার চেষ্টা করুন। উক্ত আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে শুধু মাত্র এবং তাঁর পরে আট শ্রেণীর বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, সুতরাং যেই ব্যক্তির এই আটটি শ্রেণির মধ্যে যাকাত দিবে তাঁর যাকাত আদায় হবে আর যে ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী দিবে সে আল্লাহর বিধানকে অমান্যকারী গোনাহগার হিসেবে গন্য হবে এবং তাঁর যাকাত আদায় হবে না। আর উক্ত আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে আল্লাহ 'আলিম বা মহাজ্ঞানী, আল্লাহ হাকীম বা প্রজ্ঞাময়ী। অতএব আল্লাহ তা'য়ালাই অধিক জানে, অধিক বুঝে কাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে, আর কাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। কাজেই আল্লাহ তা'য়ালা যাদেরকে যাকাত দেয়ার আদেশ দিয়েছেন একমাত্র তাদেরকেই যাকাত দিতে হবে আর এটাই হলো আল্লাহর বিধান। অন্য কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না এবং দিলে যাকাত হবে না। বরং যাকাত দাতা বড় গোনাহগার হয়ে যাবে। তবে আরো একটা ফিতনা সাথেই থাকে, তা হলো

কুরআন মাজিদের উক্ত আয়াতটি ব্যবহার করেই আলেম নামের এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা মাদরাসা ও ইয়াতিম খানা নামের সাইনবোর্ডটি গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে গ্রাম-মহল্লায় নেমে পড়ে। এই সকল ব্যবসায়িকদেরকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না। দিলে যাকাত আদায় হবে না। মসজিদ-মাদরাসায় কোনভাবেই যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না। ইয়াতিমদের নাম ভাঙিয়ে ইয়াতিম খানার নাম দিয়েও যারা যাকাতের টাকা উঠায় তাদেরকেও যাকাতের টাকা বা সম্পদ দেয়া যাবে না। কোনভাবেই এই সকল স্থানে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে না। তবুও যারা উদারতা দেখিয়ে বলেন, ইয়াতিম খানা তো ইয়াতিম সন্তানদের জন্য কিছু অর্থ দিই তাদেরকে একটি বাস্তব উদাহরণ বলছি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। তা হলো- আমার এক মুসলিম বোন, তাঁর স্বামী পরিবারের কোন খোজ খবর রাখে না। এই বোনটির একটি ছেলেকে এবং একটি মেয়েকে হাফিজিয়া মাদরাসাতে ভর্তি করেছেন। সন্তান দুইটি এখন হাফেজে কুরআন আলহামদুলিল্লাহ। তাদের হাফেজি পড়া শেষে এখন জামাত খানায় ভর্তি করেছে মাওলানা পড়ানোর জন্য। বোনটির বাড়ি রাজশাহীতে কাজেই রাজশাহী শহরের কোন এক মাদরাসাতে ভর্তি করেছেন। সেই মাদরাসার নাম আমি বলছিনা। অতঃপর সেই মাদরাসাতে খাওয়া খরচ দুই ভাবে ধরা হয়।

১। হাইকোয়ালিটির খাবার ও ২। নরমাল। (যার ফি মাসে ১৫০০ টাকা)

আমি বোনের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে মাসে ১৫০০ করে টাকা মাদরাসাতে দাও তো সেখানকার খাওয়া দাওয়া কেমন? সে বলল, ঐ মাদরাসাতে দুই কোয়ালিটির খাবার দেয় এবং তাঁর ফি দুই কোয়ালিটির হিসেবে নেয়। আমি যেই ১৫০০ টাকা দেই তা নরমাল কোয়ালিটির খাবার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি কি খাবার দেয়? মাসে কতদিন মাছ, কত দিন গোস্ত বা ডিম কিংবা সবজি দেয়? বলল- সপ্তাহে একদিন ছোট এক পিছ মাছ দেয়, আর প্রতি শুক্রবারে দুই পিছ করে ব্রয়লার মুরগির গোস্ত দেয়। আর মাঝে মধ্যে ১/২ দিন ডিম দেয়। বাকি দিনগুলো ডাউল ও সবজি। আমি জেজ্ঞেস করলাম হাইকোয়ালিটিতে কি খাবার দেয়? সে বলল, প্রতিদিনই প্রায় মাছ, গোস্ত থাকবেই। তাঁর কথা শুনে আমি ততক্ষণে বলেই ফেললাম সামনের মাস থেকে তোমাকেও হাইকোয়ালিটিরই দেবো আর ৫০০ টাকা এটা ব্যাপার না। পরক্ষণেই আবার চিন্তা করলাম আমি না হয় একজন ছেলেকে এই ব্যাবস্থা করে দিলাম, কিন্তু আর বাকি সন্তানগুলোও তো সেই একই কষ্টের মধ্যে রয়েছে। তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার নামে দেওয়া হচ্ছে অনৈসলামিক শিক্ষা। যেখানে ধনী-গরিবের ভেদাভেদ ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য ইসলাম দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের

সাথে আদায়ের জন্য তাকিদ দিয়েছে সেখানে এই ইসলাম শিক্ষার কারখানাতেই ধনী-গরিবের ভেদাভেদ শিখানো হচ্ছে। তাহলে খুজে পাওয়া যাবে ইসলাম? সাধারণ মুসলমান কোথা থেকে ইসলাম শিখবে? অতঃপর আমি চিন্তা করলাম এই ছেলেকে আর ঐ মাদরাসাতে পড়ানো যাবে না। কাজেই একটি মাদরাসার খোজ করা লাগবে। অতঃপর খোজ করতে গিয়ে দেখি প্রায় গুলোতেই সেই একই সমস্যা। কাজেই আমি এবার সন্ধান নিতে থাকলাম মাদরাসাগুলোর আয়ের উৎস কী? দেখা গেলো যে, এই মাদরাসাগুলোতে অন্যান্য আয়ের উৎসের সঙ্গে রয়েছে গরিব-দরিদ্র ছাত্রদের জন্য স্পেশালী আয়ের উৎস যেমন- যাকাতের টাকা, কুরবানীর চামড়ার টাকা, যাকাতুল ফিতরের টাকা, বিভিন্ন দাতাকৃত গরিব, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য করা দান-ছাদকার টাকা ইত্যাদি। যেই মাদরাসাতে আমার সেই বোনের ছেলেটি ভর্তি করেছিলাম ওখানে ভালো ভাবে খোজ নিয়ে দেখলাম ঐ মাদরাসাতে মাঝে মধ্যেই গরিব-দরিব্র ছাত্রদের জন্য ছাগল দানে আসতো। আর সেই ছাগলগুলোকে মাদরাসার শিক্ষকগণ হয় বিক্রয় করে দিতো, নয়তো জবেহ করে গোস্তা ফ্রিজে রেখে হাইকোয়ালিটির ছাত্রদেরকে টাকার বিনিময়ে খাওয়ায় দিতো। এখন একটিবার ভালো ভাবে ভেবে দেখুন এই অর্থ, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাস, মুরগী মানুষ কাদেরকে খাওয়ানোর জন্য দান করেন? আর কাদেরকে খাওয়ানো হয়? ঐ সকল মাদরাসাগুলোতে যেই পরিমাণ দান ছদকা যায়, সেই দান-ছদকার অর্থ বা গরু, ছাগল দিয়ে ঐ সকল দরিদ্র-গরিব ছাত্রদের হাইকোয়ালিটির খাদ্যই হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও কেন গরিব ছাত্রদের প্রতিদিন নরমাল খাবার খাওয়াবে? অতএব আপনার দান-ছদকা আপনি ভেবে চিন্তে করবেন। বিশেষ করে যাকাতের অর্থ হিসাব করে সঠিক খাতে সঠিক ভাবে ব্যয় করবেন। তা ব্যতীত যাকাত কবুল হবে না, তাঁর মানে আপনি একটি ফরয ইবাদত আল্লাহর দেখানো, আল্লাহর রসূল ﷺ এর শিখানো পন্থায় আদায় করলেন না। ফলে আপনার নেকী হবেই না বরং আপনি গোনহগার হবেন। কাজেই আমি আবার বলছি যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সর্তক হোন। আমি উপরে যেই উদাহরণটি দিলাম তা বাস্তব ঘটনা, একটুও বাড়তি বা অতিরিক্ত নেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করিও না।' (২/৪২)

যাকাতের খাত বিষয়ে আরো বিস্তারিত ভাবে জানতে ও বুঝতে দেখুন আমার লেখা ''আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে'' বইটি।

■ যাকাতুল ফিতর:

যাকাতুল ফিতর এর পরিচয় ইসলামী পরিভাষায়- যাকাতুল ফিতর হলো এমন ছদকা যা রমাদানের ছিয়াম সমাপ্তির মাধ্যমে ওয়াজিব হয়। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন, ছিয়াম পালনকারীর বেহুদা কথাবার্তা ও অশ্লীলতাঁর কাফফারা হিসেবে এবং মিসকিনদের খাদ্যের জন্য। যে ব্যাক্তি ঈদের ছলাতের পূর্বে পৌঁছে (মিসকিনদের নিকট) দিবে তাঁর ছদকা করা হবে। আর যে ব্যাক্তি ঈদের ছলাতের পর পৌঁছে (মিসকিনদের নিকট) দিবে তা ছদকা (সাধারণ দান) হিসেবে গন্য হবে। (আবু দাউদ, হা: ১৬০৯)

■ যাকাতুল ফিতরের বিধান:

যাকাতুল ফিতর (আদায় করতে সক্ষম) সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব। ছোট হোক, বড় হোক, নারী হোক, পুরুষ হোক, গোলাম হোক কিংবা স্বাধীন হোক। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৫০৩; সূরা আ'লা, আঃ ১৪; আল-ইজমা -ইবনে মুনযির, পৃ: ৪৯)

■ যাকাতুল ফিতর প্রদান করা যার উপরে ওয়াজিব:

যার মধ্যে নিম্নের শর্ত দুটি পাওয়া যাবে তাঁর উপর যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব।

১। মুসলমান হওয়া ২। যাকাতুল ফিতর প্রদানের সক্ষম হওয়া। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২৬; মুগনীল মুহতাজ ১/৪০৩, ৬২৮)

■ যাদের উপর যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না:

নিসাব পরিমাণ অথবা তাঁর বাসস্থানের মূল্যের অতিরিক্ত সম্পদের মালিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁর উপর যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। (শারহু ফাতাহুল কদীর ২/২১৮; ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২৭)

অতএব যারা যাকাতুল ফিতর গ্রহণ করার উপযোগী যেমন- ফকীর, মিসকিন, অভাবী, ঋণগ্রস্ত ইত্যাদি। তাদের উপর যাকাতুল ফিতর প্রদান করা ওয়াজিব নয়। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড পৃ: ১২৭)

নবী ﷺ এর বানী- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা ব্যতীত ছাদকা নেই। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২৭; ছহীহ বুখারী, হা: ১৪২৬-১৪২৫)
আর যেই ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আছে অর্থাৎ যারা যাকাতুল ফিতর গ্রহণ করার এখতিয়ার বা অধিকার নেই এমন ব্যক্তির উপর যাকাতুল ফিতর প্রদান করা ওয়াজিব। শুধু তাঁর নিজের জন্যই যাকাতুল ফিতর প্রদান করা ওয়াজিব, তা নয়, সেই ব্যাক্তি বা কর্তার অধীনস্থ যেমন- স্ত্রী, সন্তান, গোলাম; এক কথায় তাঁর অধীনস্থ সকলের পক্ষ থেকেই যাকাতুল ফিতর প্রদান করা ওয়াজিব হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২৮; ছহীহ বুখারী, হা: ১৫০৩-১৫০৪; দারাকুতনী, হা: ২২০)

■ যে সব বস্তু দ্বারা যাকাতুল ফিতর প্রদান করবে:
যব, গম, খেজুর, কিসমিস, চাল, ভুট্টা প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা তা প্রদান করবে। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২৯; সূরা মায়িদাহ, আঃ ৮৯)

■ জানা প্রয়োজন:
বাংলাদেশে অধিক প্রচলন ও খাদ্য হিসেবে অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়ায় আমি যাকাতুল ফিতর হিসেবে চাল প্রদান করাকেই অধিক গুরুত্ব দেই। কারণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'মধ্যম মানের খাবার যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাওয়াও।' (সূরা মায়িদা, আ: ৮৯)
তবে যথার্থ কল্যাণ ও জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মূল্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর প্রদান করা বৈধ। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৩)

■ যাকাতুল ফিতর এর নিসাব বা পরিমাণ:
হযরত আমর বিন শুআইব তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, মুসলিম নর-নারী, আযাদ-গোলাম, ছোট-বড় সকলের উপর ২ মুদ্দ (অর্ধ ছা) গম অথবা অন্যান্য খাদ্যের এক সা (৪ মুদ্দ) পরিমাণ ছদকাতুল ফিতর প্রদান করা ওয়াজিব। (তিরমিযী, হা: ৬৭৪)
১ সা = ৪ মুদ্দ = ২ কেজি ১৫৮ গ্রাম। অর্থাৎ আমাদের হিসাব অনুযায়ী এক ছা হলো ২ কেজি ১৫৮ গ্রাম আর অর্ধ ছা হলো ১ কেজি ৮৯ গ্রাম। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩২)

অতএব আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত ও অধিক প্রয়োজনীয় খাদ্য চাল দ্বারা যাকাতুল ফিতর এর নিসাব বা পরিমাণ হয় ২ কেজি ১৫৮ গ্রাম।

■ যাকাতুল ফিতর প্রদার করার সময়:

যাকাতুল ফিতর ঈদের ছলাতের পূর্বে প্রদান করা ওয়াজিব। ঈদের ছলাতের পর আদায় করা যাবে না। ঈদের ছলাতের পর যাকাতুল ফিতর আদায় করলে, তা যাকাতুল ফিতর হিসেবে গণ্য হবে না। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩২)

আর যাকাতুল ফিতর আদায়ের ওয়াজিব ওয়াক্ত শুরু হবে রমাদানের শেষের দিন সূর্যাস্ত হতে। আর শেষ হয় ঈদের ছলাত শেষ হবার মাধ্যমে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ, খণ্ড, পৃ: ১৩২; ছহীহ বুখারী, হা: ১৫০৯)

জানা প্রয়োজন: ঈদুল ফিতরের একদিন বা দু'দিন পূর্বে তাড়াতাড়ি যাকাতুল ফিতর আদায় করা বৈধ। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৫১১)

■ যাকাতুল ফিতর ব্যয়ের খাত:

যাকাতুল ফিতর সমাজের গরিব, অভাবী বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের হক। অর্থাৎ অভাবী ও দরিদ্র মানুষের মাঝে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে। এমন অভাবী লোকদেরকে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে যারা যাকাত গ্রহণের অধিকার রাখে। একজন দরিদ্র মানুষকে একাধিক ফিতরা দেয়া যেমন জায়েয, তেমনি একটি ফিতরা বন্টন করে একাধিক মানুষকে দেওয়াও জায়েয। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ, খণ্ড, পৃ: ১৩৪; আবূ দাউদ, হা: ১৬০৯)

■ যাকাতুল ফিতর প্রদানের পূর্নাঙ্গ সঠিক নিয়ম:

প্রথমে যেই ব্যক্তির নিকট তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে অর্থাৎ যার উপর যাকাতুল ফিতর প্রদান ওয়াজিব হয়েছে সেই ব্যক্তি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে ২ কেজি ১৫৮ গ্রাম চাল এবং তাঁর অধীনস্থ সকল ব্যক্তি যেমন- স্ত্রী, সন্তান, পিতা, মাতা, দাস-দাসী সকলের পক্ষ হতেই প্রতিজনের উপর ২ কেজি ১৫৮ গ্রাম চাউল করে মোট সদস্য সংখ্যার চাউল একত্রিত্ব করে সেই চাউল সমাজ প্রধানের নিকট যদি জমা করার নিয়ম থাকে তবে জমা করবে অথবা নিজের সদস্যদের একত্রিত করা চাউলগুলো নিয়ে প্রথমে সমাজের অভাবী দরিদ্রদের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসবে,

যাকে বেশি দরিদ্র বা ঋণগ্রস্ত গরিব মনে হবে তাকেই প্রথমে দিয়ে দেওয়া উত্তম। অতঃপর অন্যান্য দরিদ্রদেরকে দিতে হবে। এভাবে নিজের সমাজের বা প্রতিবেশী অভাবী ঋণগ্রস্ত দরিদ্রকে প্রথমে দিয়ে মাল অবশিষ্ট থাকলে পরে দূরবর্তীদেরকে দিতে হবে। উত্তম হলো নিজের আত্মীয়-স্বজন অতঃপর সমাজ বা প্রতিবেশীকে প্রদান করা, যদি তাদের মধ্যে থেকে যাকাত নেয়ার হকদার থাকে।

■ সতর্কতা:

দেখা যায় যে, বর্তমান সমাজে যারা যাকাতুল ফিতর প্রদান করার সমার্থ রাখে তাদেরকেও যাকাতুল ফিতরের অর্থ দেয়া হয়। আবার দেখা যায় যে, গরিব, ঋণগ্রস্ত বা অভাবী লোকদেরকে অল্প কিছু মাল বা অর্থ দিয়ে বাকি বেশি অংশটাই মাদরাসা ও ইয়াতিমখানা যুক্ত মাদরাসাতে দেয়া হয়। এটা করা যাবে না। যাকাতুল ফিতর কোন মাদরাসার হক নয়, এটা সমাজের গরিব-দুঃখী, অভাবী ঋণগ্রস্তদের হক। সুতরাং হকদারকে তাঁর হক দিতে হবে, তা ব্যতীত যাকাতুল ফিতর আদায় হবে না বরং হকদারের নিকট দাতারা ঋণগ্রস্ত হয়ে যাবে আর এরকম বান্দার হক নষ্ট করে মৃত্যুবরণ করলে এই ঋণ মৃত্যুর পরেও পরিশোধ করতে হবে, যদি না দাতারা দুনিয়া থেকেই হকদারের নিকট থেকে মাফ নিয়ে না মৃত্যুবরণ করে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ, খণ্ড, পৃ: ১৩৩)

৪. ছিয়াম

■ ছিয়াম এর পরিচয়:

ছিয়াম ও ছাওমের শাব্দিক অর্থ- কোন কিছু থেকে বিরত থাকা। সব ধরনের বিরত থাকা অর্থেই ছাওম শব্দটি ব্যবহৃত হয়। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৭; সূরা মারিয়াম, আঃ ২৬)

শরীয়াতের পরিভাষায় আল্লাহর ইবাদতের নিয়তে ফরজ উদিত হওয়ার সময় থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত ভঙ্গ করে এমন সকল কাজ থেকে বিরত থাকাকে ছিয়াম বলে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৭)

■ ছিয়াম এর ফাযিলাত ও উপকারিতা ১২ টি:

১। ছিয়াম পালন হলো আল্লাহর সবচেয়ে বড় আনুগত্য, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য হাসিল করা যায়। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৭)

২। ছিয়ামের বিনিময় মান আল্লাহ সরাসরি নিজেই দিবেন। (ছহীহ বুখারী হা: ১৯০৪)

৩। ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯০৪)

৪। ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মেশকের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি লাগে। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৮০৫)

৫। ছিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি বিষয় যা তাকে খুশি করবে।

(ক) যখন সে ইফতাঁর করে, সে পরিতৃপ্ত (খুশি) হয়।

(খ) এবং যখন সে তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন ছাওমের বিনিময় পেয়ে আনন্দিত হবে।

৬। ছিয়াম পালনকারীর অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯০৪)

৭। কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন ছিয়াম রাখলে ঐ ছিয়ামের বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর (৭০) বছরের দূরত্ব সরিয়ে দেন। (ছহীহ বুখারী, হা: ২৮৪০)

৮। যারা ছিয়াম পালন করে জান্নাতে তাদের জন্য বিশেষ একটি দরজা (রইয়ান) রয়েছে, যে দরজা দিয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করবে। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৮৯৬)

৯। ছিয়াম হলো নৈতিক চরিত্র গঠনের বড় বিদ্যাপিঠ। যার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে বিভিন্ন অভ্যাস গঠনের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৯)

১০। ছিয়াম মনের জিহাদ স্বরূপ এবং প্রবৃত্তি প্রতিরোধকারী। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৯)

১১। ছিয়াম দ্বারা মানুষ যে বিপদাপদে ও কষ্ট ক্লেশের সম্মুখীন হয় তাঁর উপর সবর করার অভ্যাস তৈরি হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালা যা হারাম করেছেন তা পরিত্যাগ করে তাঁর উপর ধৈর্য্য ধারণের অনুশীলন করা সম্ভব হয়। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৯)

১২। ছিয়াম শৃঙ্খলা ও সংহতির শিক্ষা দেয়। মানুষের মাঝে দয়া ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বাড়িয়ে দেয় এবং পরস্পরে সহযোগীতা ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেতনাকে উন্নত করে; যার ফলে মুসলমানদের সম্পর্ক মজবুত ও সুদৃঢ় হয়। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৯)

■ ছিয়ামের প্রকারভেদ:

ছিয়াম দুই প্রকার-

১। ফরয ছিয়াম ও ২। নফল ছিয়াম।

ফরয ছিয়াম আবার তিন প্রকার। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৪২২; ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৯)

ক) রমাদান মাসের ছিয়াম সাধনা।

খ) কোন কারণে যে ছিয়াম ওয়াজিব (ফরয) হয়। যেমন-কাফফারার ছিয়াম।

গ) ব্যাক্তি নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়ার কারণে যে ছিয়াম ওয়াজিব (ফরয) হয়। যেমন- মানতের ছিয়াম।

জানা প্রয়োজন: এই পরিচ্ছেদে আমাদের আলোচনা রমাদানের ফরয ছিয়াম নিয়ে।

■ রমাদানের ছিয়াম:

ছিয়ামের বিধান- রমাদান মাসের ছিয়াম প্রত্যেক সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক মুমিন মুসলমানের উপর ফরয। ছিয়াম ইসলামের স্তম্ভসমূহের একটি অন্যতম স্তম্ভ। (ছহীহ বুখারী, হা: ৮)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'হে মুমিনগণ তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যে ভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর'। (সূরা বাকারাহ, আঃ ১৮৩)

■ ছিয়াম শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ ২ টি:

১। হায়য (ঋতু) এবং নিফাস (প্রসব পরবর্তী অপবিত্রতা) থেকে পবিত্র হওয়া: কারণ, ছিয়াম আদায় ওয়াজিব হওয়া এবং শুদ্ধ হওয়া উভয়টির জন্য শর্ত পবিত্রতা। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৬; ফাতহুল কদীর ২/২৩৪)

২। নিয়্যাত: কারণ, রমাদান মাসের ছিয়াম পালন একটি ইবাদত। অন্যান্য ইবাদাতের ন্যায় এই ইবাদাতও নিয়্যাত ব্যতীত শুদ্ধ হবে না। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৬)

ইমাম নবাবী (রহিঃ) বলেন, নিয়্যাত ব্যতীত ছিয়াম পালন শুদ্ধ হবে না। আর নিয়্যাতের স্থান হলো অন্তর। (রওযাতুত তালিবীন ২/৩৫০)

■ নিয়্যাতের পূর্ণতা লাভের জন্য চারটি শর্ত রয়েছে:

১। দৃঢ়তা: নিয়্যাতে দোদুল্যময় অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হবে। (আল-হিদায়া ২/২৪৮)

২। নির্ধারিত হতে হবে: রমাদান মাসের ছিয়াম এবং অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব ছিয়ামের ক্ষেত্রে নিয়্যাত নির্ধারিত হতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৭)

৩। রাতে নিয়্যাত করা: সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ফরজ উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রাতে নিয়্যাত করা। (আবু দাউদ, হা: ২৪৫৪)

৪। রমাদান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে নিয়্যাত নবায়ন বা নতুন ভাবে করতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৭)

■ ছিয়ামের ফরয সমূহ:

ছিয়ামের ফরয হচ্ছে সূর্য উদিত হওয়ার সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম ভঙ্গ করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "অত:পর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য দান করেছেন তা আহার কর, আর পানাহার কর। যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র দেখা যায়। অতঃপর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত।" (সূরা বাকারাহ, আঃ ১৮৭)

■ ছিয়ামের সুন্নাত ও আদব সমূহ ৯ টি:

১। সাহরী খাওয়া। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯২৩)

২। বিলম্বে সাহরী খাওয়া। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯২১; ইবনে হিব্বান, হা: ৩৪৭৪)
জানা প্রয়োজন: খাবার খেতে খেতে আযান শুনলে খাওয়া বন্ধ না করে দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার খেয়ে নিতে হবে। (আবু দাউদ, হা: ২৩৩৩)

৩। সূর্যাস্ত হওয়া মাত্রই দ্রুত ইফতাঁর করা। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯৫৭)

৪। কাঁচা অথবা পাকা খেজুর (যদি সম্ভব হয়) অথবা পানি দিয়ে ইফতাঁর করা। (আবু দাউদ, হা: ২৩৫৬)

৫। ইফতারের সময় নিম্নের দু'আ পাঠ করা।
"জাহাবাজ্ব জ্বমায়ু্য ওয়াব তাল্লাতিল উ'রুক্ব, ওয়া সাবাতাল আজরু ইংশাআল্লাহ"
অর্থ- তৃষ্ণা দুরীভূত হয়েছে, শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং ইংশাআল্লাহ প্রতিদান লিপিবদ্ধ হয়েছে। (আবু দাউদ, হা: ২৩৫৭)

৬। জনকল্যানকর কাজ করা ও কাজে অগ্রামী হওয়া। (ছহীহ বুখারী, হা: ৬)

৭। কুরআন পাঠ করা এবং কুরআনের আলোচনা করা। (ছহীহ বুখারী, হা: ৬)

৮। ছিয়ামের নেকী কমিয়ে দেয় এমন ব্যাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯০৩-১৯০৪)

৯। ছিয়াম পালনকারীকে যখন গালি-গালাজ করা হবে তখন তিনি যেন বলেন, আমি ছিয়াম পালনকারী। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯০৪)

■ ২ প্রকার কাজে ছিয়াম ভঙ্গ বা বাতিল হয়:

(ক) এমন কাজ যা ছিয়ামকে বাতিল করে দেয় এবং ছিয়ামের কাযা আদায় করা ওয়াজিব। (সূরা বাকারাহ, আঃ ১৮৭)

উপরোক্ত প্রকার আবার ৬ টি:

১। ছিয়ামের ব্যপারে স্বরণ থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছায় পানাহার করলে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৮) তবে যদি ভুলে পান করে অথবা আহার করে, তাহলে তাঁর ছিয়াম বাতিল হবে না। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯২৩)

২। স্বেচ্ছায় বমি করলে। তবে কারো অনিচ্ছাকৃত ভাবে বমি বের হয়, তাহলে কাযা আদায় করতে হবে না এবং কাফফারাও দিতে হবে না। (আবু দাউদ, হা: ২৩৮০)

৩। হায়য (ঋতুস্রাব) এবং নিফাস (সন্তান প্রসব পরবর্তী অপবিত্রতা)।

৪। স্বেচ্ছায় বীর্যপাত ঘটানো। (আদ-দুররুল মুখতাঁর ২/১০৪)

৫। ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলার নিয়্যাত করা। (আল-মুহাল্লা ৬/১৭৫; ছহীহ বুখারী, ১)

৬। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা। (আল-মুগনী, ৩/২৫; সুরা যুমার, আঃ ৬৫)

(খ) এমন কাজ যা ছিয়ামকে বাতিল করে দেয় এবং ঐ ছিয়ামের কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয়। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৫) আর এ ধরনের কাজ শুধু একটি তা হলো- স্ত্রী সহবাস করা। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯৩৬)

■ যে সকল কারণে ছিয়াম বাতিল হয় না তা ১৭ টি:

১। জুনুবী (বীর্যপাত হওয়ার পর যে ব্যাক্তি এখনও গোসল করেনি)। এ অবস্থায় সকাল করলে। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯২৬)

২। বীর্যপাত হওয়ার আশংকা না থাকলে স্ত্রীকে চুম্বন করা ও জড়িয়ে ধরা। (আবু দাউদ, হা: ২৩৮৪)

৩। গোসল করা এবং মাথা ঠান্ডা করার জন্য পানি ঢালা। (আবু দাউদ, হা: ২৩৪৮)

৪। কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া, কিন্তু অতিরিক্ত না করা। (ইবনু মাজাহ, হা: ৪০৭)

৫। যদি পেটে না পৌছে তবে প্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ নেওয়া। যেমন তরকারী রান্নার সময় ঝোল জিহবাতে লাগানো, ইত্যাদি। (ইবনে আবু শাইবাহ ৩/৪৭; ছহীহ বুখারী ৪/১৫৩)

৬। দুর্বল হওয়ার আশংকা না থাকলে শিঙ্গা লাগানো ও রক্ত দান। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯৩৯)

৭। চোখে সুরমা লাগানো। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

৮। পায়ুপথে ঔষধ প্রবেশ। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

৯। ড্রপ ব্যবহার করা। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

১০। ঘ্রাণ নিলে। (ফিকহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

১১। মিসওয়াক করলে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

১২। থুথু-শ্লেষ্মা গিলে ফেললে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

জানা প্রয়োজন: নাক থেকে বের হয় এমন তরল পদার্থ অথবা এমন কফ যা বুক থেকে উপরে উঠে আসে তাকে শ্লেষ্মা বলে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

১৩। গিলে ফেলা থেকে বাঁচা যায় না এমন জিনিস গিলে ফেললে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

১৪। ভুলে পান করলে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

১৫। ভুলে আহার করলে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯২৩)

১৬। ভুলে স্ত্রী সহবাস করলে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯১)

১৭। অনিচ্ছায় বমি হলে। (আবু দাউদ, হা: ২৩৮০)

■ যারা ছিয়াম করবে:

শরীয়াত সম্মত কোন কারণ ছাড়া প্রত্যেক মুসলমান প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেক সম্পন্ন, সুস্থ, মুক্বীম এবং হায়য ও নিফাস থেকে পবিত্র মহিলা, এই সকল মানুষের জন্য ছিয়াম থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ ছিয়াম না করা জায়েয নয়। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০৮)

৫. হাজ্জ

হাজ্জ আদায় করা ফরয। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মানুষের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহর হাজ্জ করা ফরয, যারা সেথায় যাওয়ার সামর্থ্য রাখে এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ বিশ্ব জগৎসমূহের মুখাপেক্ষী নয়।" (সূরা মায়িদা, আঃ ৯৭)

■ জানা প্রয়োজন:

উপরোক্ত আয়াত থেকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে হাজ্জের গুরুত্ব সম্পর্কে। অতএব কোন ব্যক্তির হাজ্জ আদায়ের সামর্থ্য থাকা সত্বেও অর্থ খরচের ভয়ে হাজ্জ আদায় না করাও হাজ্জের হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করার অন্তর্ভুক্ত।

■ কবুলকৃত হাজ্জের ফাযিলাত:

হাদিছ: হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম 'আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, হাজ্ব-ই-মাবরুর (কবুল হজ্জ)। (ছহীহ বুখারী, হা: ১৫১৯)

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখিত ইসলামের ৫ টি বুনিয়াদ বা স্তম্ভ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি ৫ টি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রসূল।

২। ছলাত প্রতিষ্ঠিত করা। ৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। কা'বা গৃহের হাজ্ব করা। ৫। রমাদান মাসে ছিয়াম পালন করা।

(ছহীহ বুখারী, হা: ৮)

আলোচ্য বিষয়:

■ সূরা সমূহ:

<u>সূরা কাফিরূন</u>

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٣﴾

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿٤﴾

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٥﴾

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾

<u>সূরা নাছর</u>

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴿٢﴾

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

<u>সূরা লাহাব</u>

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿١﴾

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾

وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

সূরা ফালাক

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾

مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾

اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾

[সমাপ্ত]